শেলি

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

শেলী

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.pathagar.com

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১১৯
গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য সংস্করণ
আশ্বিন ১৪০১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

দ্বিতীয় সংস্করণ দ্বিতীয় মুদ্রণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ জুন ২০০০

প্রকাশক
হুমায়ুন কবীর
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

মুদ্রণ
নাটোর প্রেস লিমিটেড
৮৯ যোগীনগর রোড, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
চল্লিশ টাকা

ISBN-984-18-0118-3

www.pathagar.com

ভূমিকা

৪ আগস্ট, ১৭৯২ সালে সাসেক্সের হর্সহামের নিকটবর্তী এক বনেদি পরিবারে পার্সি বিশি শেলি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা সাসেক্সের ধনী ব্যারন স্যার. বিশি শেলি, বাবা পার্লামেন্টের সদস্য মিস্টার টিমথি শেলি, আর মা এলিজাবেথ পিলফোর্ড; ইনিও ধনী পরিবারের মেয়ে—কবিতা ও ছবির প্রতি তাঁর আসক্তি প্রবল। শেলির পাঁচ বোন—এলিজাবেথ, হেলেন (জন্মের চার মাসের মধ্যেই এর মৃত্যু ঘটে), মেরি, হেলেন, মারগারেট, আর ভাই জন।

শেলির চেহারা সম্পর্কে এরকম বর্ণনা পাওয়া যায় : 'যেন কিশোর দেবতা, রেশমের মতো নরম গুচ্ছ গুচ্ছ কালো কেশ, নীল চোখে স্বপ্নের মায়া কাজল—যেন কোনো গ্রিক দেবতা শিশুরূপ ধারণ করে হাজির হয়েছে বিশি পরিবারে।'

পারিবারিক পরিবেশ থেকে তাঁকে পাঠানো হয় দশ বছর বয়সে সিয়ন হাউস একাডেমিতে। এখানকার শিক্ষক এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আবিষ্কারক এ্যাদম ওয়াকার শেলিকে আজীবনের জন্য বিজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত করে তোলেন। অন্যদিকে শিক্ষক অভিদের অনুপ্রেরণায় তিনি ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবের গল্পে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

এরপর ২৯ জুলাই ১৮০৪-এ তিনি ভর্তি হলেন ইটন কলেজে। এখানেই শেলির বিদ্রোহী সত্তার প্রথম বিকাশ লাভ করে। বিজ্ঞানের প্রতি দারুণ অনুরক্ত শেলি এ্যাদম ওয়াকারের আবিষ্কৃত একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র কেনেন, এবং একটি বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা চালাতে গেলে শিক্ষক বেথেন বৈদ্যুতিক শক পান—এবং তিনি 'উন্মাদ শেলি' নামে, ইটনে খ্যাত হয়ে ওঠেন। ইটনের একটি পুরনো প্রথা ফ্যাগিং অর্থাৎ বড়ছেলেদের কাজকর্ম—যেমন ফাই-ফরমাশ খাটা, এমনকি চাকরের কাজও ছোটছেলেদের করতে হয়। এই প্রথা অনেকদিন ধরে চলে আসছিল। শেলি এই ন্যাক্কারজনক প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। একবার এক জুলুমবাজ ছেলের হাতে তিনি পেন্সিল-কাটা ছুরি বসিয়ে দেন, সেই ছুরি গিয়ে লাগে ডেস্কে। এরপর তাঁকে আর কেউ ঘাঁটাতে সাহস করে নি।

এরি মধ্যে শেলি গদ্য ও পদ্য রচনা শুরু করে ছাপাতে আরম্ভ করেছেন। ১৮০৯ খৃস্টাব্দে তিনি গোথিক রোমান্স *Zastrozzi* ছাপিয়ে প্রকাশকের কাছ থেকে লাভ করেন ৪০ পাউন্ড। ইটনের শেষদিকেই তাঁর মাথায় সনাতন ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে বিরূপ চিন্তাভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আর এই ভাবনা-সম্পর্কিত চিঠিপত্র পাঠ করেই তাঁর কিশোরী প্রেমিকা হ্যারিয়েট গ্রোভ ঘাবড়ে গিয়ে পিতাকে চিঠিগুলো দেখালে শেলির প্রথম কৈশোরিক প্রেমের সমাপ্তি ঘটে।

১৮১০ খৃস্টাব্দে শেলি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে চার বছরের জন্য ভর্তি হলেন। এখানে আসার পরপর তিনি হিউম, লক এবং সেই সঙ্গে গডউইনের *Political Justice* পড়ে ফেললেন। আস্তে আস্তে শেলির ধারণা হল, তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন একটি মহান ব্রত সফল করার উদ্দেশে। বন্ধুত্ব হয় টমাস জফারসন হগ-এর সঙ্গে; ইনি পণ্ডিত, সংশয়বাদী এবং

www.pathagar.com

বয়োজ্যেষ্ঠ। দুজনে মিলে বের করলেন প্রবন্ধের পুস্তিকা 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা'। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিচারে 'একজন নৈয়ায়িক এবং গতানুগতিক ভাবনার বিরোধী হিসাবে' ২৫ মার্চ ১৮১১ সালে শেলি এবং হগ বহিষ্কৃত হন।

শুধু তাই নয়, পরিবার থেকেও ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন শেলি। এরপর শুরু হয় এক উদ্যমী একগুঁয়ে রোমাঞ্চকর ঝড়ো জীবনযাপন যেখানে পদে পদে তার সঙ্গী হয়েছে প্রেম, প্রত্যাখান, অর্থশূন্যতা, একাকিত্ব ; সেইসঙ্গে এ্যাডভেঞ্চার। কিছুকাল আগে পরিচিত হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুককে শেলি ২৮ আগস্ট ১৮১১ সালে এডিনবার্গে বিবাহ করেন। বসবাস শুরু করেন লেক ডিস্ট্রিক্টের একটি আস্তানায়। কিন্তু এই নারী আর ওই আস্তানাই তাঁর জীবনের স্থায়ী কোনো বন্ধন নয়। তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী ঘটনাবহুল জীবনে তিনি জড়িয়ে পড়েন বহু রমণীর সঙ্গে।

ইতিমধ্যে তিনি গডউইন পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত তিনি আয়ারল্যান্ডের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য সেখানে চলে যান। সেখানে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেই তাঁর একটি প্রধান কাব্য 'কুইন ম্যাব' রচনা সম্পন্ন করেন। লন্ডনে ফিরে এলে আবার দেখা হয় গডউইন ও তাঁর কন্যা মেরির সঙ্গে। পরিচয় হয় প্রকাশক পিককের সঙ্গে। ১৮১৩ সালের দিকে শেলি হঠাৎ নিরামিষি হয়ে ওঠেন। এ বছরই তাঁর 'কুইন ম্যাব' প্রকাশিত হয়। জুনের শেষে হারিয়েটের গর্ভে শেলির প্রথম কন্যা এলিজা আয়ন্থির জন্ম। ১৯১৪ সালে তিনি শেষবারের মতো পিতৃগৃহ 'ফিল্ড প্লেসে' গমন করেন। জুনে মেরি গডউইন ও শেলি প্রকাশ্যে তাদের ভালোবাসার ঘোষণা দেন। এবং এক অর্থে হ্যারিয়েটের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই মেরি শেলিকে নিয়ে ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের মধ্যে পালিয়ে যান সোজা ফ্রান্সে ; সেখান থেকে সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, হল্যান্ড। সেপ্টেম্বরে ফেরেন আবার লন্ডনে। হ্যারিয়েটের গর্ভে নভেম্বরে শেলির পুত্র চার্লসের জন্ম হয়। ১৮১৫ সালে দাদার মৃত্যু হলে উইলের মাধ্যমে শেলি আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা নিশ্চয়তার মধ্যে ফিরে এলেন। ফেব্রুয়ারিতে মেরির গর্ভে তাঁর একটি সন্তান জন্ম হয় এবং সন্তানটি কয়েকদিনের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে। পরের বছরই মেরির গর্ভে পুত্র উইলিয়ামের জন্ম। ফেব্রুয়ারি ১৮১৬–তে *Alastor* দীর্ঘ কবিতাটি ছাপা হয়ে বেরোয়। এ বছরেই শেলির সঙ্গে বায়রনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নভেম্বরে আত্মহত্যা করেন শেলির প্রথম স্ত্রী হ্যারিয়েট। ডিসেম্বর মাসে শেলির *Hymn to Intellectual Beauty* ছাপা হয়ে বের হয়। এ মাসেরই ৩০ তারিখে শেলি মেরি গডউইনকে বিয়ে করেন।

১৮১৭ সালের সেপ্টেম্বরে মেরির গর্ভে কন্যাসন্তান ক্লারার জন্ম। এসময়েই তিনি লেখেন প্রতিবাদী কাব্য লাওন ও সিথনা—পরবর্তীতে যার নাম বদলে রাখা হয় *The Revolt of Islam.* পরের বছর শেলি ইটালি গমন করেন। সেপ্টেম্বরে ভেনিসে ক্লারার মৃত্যু। এখানে তার *Julian and Maddalo* এবং *Lines Written Among the Engean Hills* কাব্যদুটি শেষ করেন। সেইসঙ্গে শুরু করেন *Prometheus Unbound*–এর প্রথম স্বর্গ।

১৮১৯ সালের জুনে পুত্র উইলিয়ামের মৃত্যু ঘটে। ইতিমধ্যে তিনি শেষ করেন *Prometheus Unbound*–এর পুরোটাই। এ বছর অনেকগুলো সফল রচনা তিনি শেষ করেন। যেমন : *Conce, The Mask of Anarchy, A Philosophical view of Reform, Ode to the West Wind, Peter Bell the Third.* পার্সি ফ্লোরেন্স নামে একটি পুত্র সন্তানেরও জন্ম দেন এ বছর।

www.pathagar.com

২০ জানুয়ারি ১৮২০, শেলি পিসায় চলে আসেন। এখানে *Sensitive Plant, To a Skylark, The Witch of Atlas* ইত্যাদি তাঁর কতিপয় বিখ্যাত কবিতার জন্ম।

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২১ সনে কীটসের মৃত্যু হয় রোমে। শেলি তাঁর স্মরণে শোকগাথা 'এডোনিস' রচনা করলেন। লিখলেন *Epipsychidian* তাঁর অন্যতম সেরা একটি প্রেমের কবিতা। এবছরই তিনি লেখেন কবিতার সপক্ষে আলোচনা *Defence of Poetry.* শেষ করেন *Hellas.*

১৮২২-এ খোলা জায়গায় বসে বসে লেখেন *The Triumph of Life.* ৮ জুলাই। দুপুর। বজ্রপাত ও বৃষ্টির পর তখন আকাশ পরিষ্কার। তাঁর জাহাজ 'ডন জুয়ান'-এ করে লেগহর্ন থেকে স্পেজিয়া যাওয়ার পথে ঝড়ে জাহাজডুবিতে তাঁর বিপন্ন মৃত্যু। শেলির মৃতদেহ তীরে এসে ঠেকে নৌকাডুবির দশদিন পর। তখন তাঁকে চেনা যায় নি। শরীরের অনেক অংশ সামুদ্রিক মাছ খেয়ে ফেলেছিল। তাঁর এক পকেটে সোফোক্লিস, আর এক পকেটে কীটসের এনডিমিয়ন, দোমড়ানো-মোচড়ানো— যেন পড়তে পড়তে তাড়াতাড়ি পকেটে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে।

এই হচ্ছে সমগ্র 'শেলি'র জীবনের অলঙ্কারহীন নিরেট গল্প। শেলি হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবিদের একজন আর তাঁর জীবন 'মাত্র ৩০ বছরের', অথচ সংঘাতময় ও আপসহীনতায় এই স্বল্পকালীন জীবনটির প্রতিটি মুহূর্ত বেদনায়, বিপ্লবে, রোমাঞ্চে ও উন্মত্ততায় হয়ে উঠেছে অনন্য, উপমাহীন। বলা যায় শেলির জীবন একটি শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক উপন্যাস যার নায়ক—দৃঢ়, আত্মপ্রত্যয়ী, কবি এবং বিদ্রোহী।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থটি অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক ভাষায় লেখা, যেমনি গীতল এর ভাষা তেমনি সূক্ষ্ম অনুভূতি দিয়ে তিনি শেলিকে যেন চাক্ষুষ করে তুলেছেন। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠক শেলির অদ্ভুত জীবনকাহিনী তো উপলব্ধি করবেন; সঙ্গে সঙ্গে শেলির সমুদয় সাহিত্যের প্রতিও একটি আসক্তিবোধ গড়ে উঠবে।

এই মহৎ গুণটির জন্যই বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র দুষ্প্রাপ্য এই গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশের দায়ভার গ্রহণ করছে—যাতে বিশ্বসাহিত্যের সেরা এক কবির সংস্পর্শে এসে তাঁর বিস্ময়কর জীবন ও শিল্পের মুখোমুখি হওয়া সকলের জন্য সহজতর হয়।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (১৫. ১. ১৯০৫-১৯৬৪) গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, ধর্ম—প্রায় সব বিষয়েই লিখেছেন। বিশেষ করে শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর দান স্মরণীয়। চলচ্চিত্রজগতে চিত্রনাট্যকার, কাহিনীকার, গীতিকার, চিত্রপরিচালক এবং অভিনেতারূপেও তিনি কাজ করেন। আকাশ বাণীর বিদ্যার্থীমণ্ডল ও পল্লিমঙ্গল আসরের প্রতিষ্ঠাতা, দীর্ঘদিন গল্পদাদুর আসরের পরিচালক এবং 'গল্পভারতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি : 'মহীয়সী', 'সান ইয়াৎ সেন', 'শতাব্দীর সূর্য', 'মা' (অনুবাদ), 'শেক্সপিয়ারের কমেডি', 'শেক্সপিয়ারের ট্রাজেডি', 'নূতন যুগের নূতন মানুষ', 'কুলি' (অনুবাদ), 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' (অনুবাদ), 'এইচ জি ভয়েলসের গল্প' প্রভৃতি। তাঁর কৃত জয়দেব রচিত গীত-গোবিন্দ-এর বঙ্গানুবাদও অত্যন্ত জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য।

শহিদুল আলম
২২/২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল, ঢাকা।

www.pathagar.com

শেলি

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

"আমি আজকে শেলিকে আমাদের এই সভাতে, আমাদের এই বাঙ্গালীর সভাতে, আদর করে ডাকছি; আমি এই জন্যেই বলছি যে তোমার বাণী আমাদের বাণী। তোমার কাব্যে পৃথিবীর সকল মানুষের কথা, বিশেষভাবে আমাদের এই কালের, আমাদের এই দেশের। প্রবল বিদ্রোহ নিয়ে তিনি যে-সব প্রচণ্ড শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে তাদের দ্বারা পীড়িত হয়েছেন, তাড়িত হয়েছেন, সেই শক্তি আমাদের সমস্ত দেশকে ব্যাপ্ত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার দুর্গ বাইরে নয়, মনে। এই যে প্রচণ্ড শক্তি এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, বিদ্রোহের ধ্বজা তুলতে হবে! কবির কাছ থেকে তার সম্মতি আসবে। এই জন্য বলছি যে আজিকার দিনে তোমাকে আমরা অভিবাদন করি, তোমাকে আমরা আহ্বান করি আমাদের মনের মধ্যে আমাদের আপনাদের মধ্যে, তুমি তোমার সিংহাসন গ্রহণ কর।"

—রবীন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

নির্ঝরিণী উপলবিক্ষতা

ফরাসি-বিপ্লবের রক্তশিখার আলোয় আভিজাত্য-গৌরবী ইংলন্ড সভয়ে দেখিল, এই নূতন সাম্যমন্ত্রের ভাবস্রোত যদি বাধাপ্রাপ্ত না হয়—যদি ইংলন্ডের অভিজাতশ্রেণীর তরুণরা এ নবভাবের মাদকতায় মত্ত হয়—

সেইজন্য ইটনের স্কুলে বিশেষ সতর্কতার সহিত ইংলন্ডের ভবিষ্যৎ নেতাদের শিক্ষা দেওয়া হইত—যাহাতে কোনো অসতর্ক মুহূর্তের ছিদ্রপথ দিয়া ফরাসি মাদকতা আসিয়া ইংলন্ডের বিচার-বিজ্ঞ রক্ষণশীলতার লৌহবর্মে না আঘাত করে। নিয়ম, নিষ্ঠা, অতীতের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা, গুরুজনে ভক্তি, যাহা সনাতন তাহাই সত্য—এইসব তত্ত্বে তরুণ অভিজাত বালকদের চিত্ত গড়িয়া তোলাই ছিল ইটনের স্কুলের প্রধান দায়িত্ব।

ইহার জন্য যে একান্ত কড়া শাসন প্রয়োজন—তাহা ছাত্রদের পিতারা স্বীকার করিতেন এবং ইটনের অধ্যাপকগণও তাহাতে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা প্রকাশ করিতেন না। বিদ্রোহ যদি দমন করিতে হয়, কৈশোরেই তাহা দমন করা শ্রেয়। অভিজাত অভিভাবকগণও এই দমন-নীতিতে সন্তুষ্ট হইতেন—পিতৃদ্রোহী সমাজদ্রোহী পুত্রের আশঙ্কা চলিয়া যাইত।

ডাক্তার কিটও ছিলেন একজন পাকা রকমের হেডমাস্টার। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বেতের আগায় যে-কোনো ছেলেকে জীবনের যে-কোনো পথে আগাইয়া দেওয়া যায়। তাই তিনি সদা সর্বদা বলিতেন, জীবনকে সর্বদাই পবিত্র রাখবে এই বাইবেল, নইলে দেখছ এই বেত—

এই দমন-নীতিটা সংক্রামক ব্যাধির মতো শিক্ষকদের নিকট হইতে ছাত্রদের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছিল। স্কুলের 'চাঁই'দের প্রত্যেকের একটি করিয়া অনুগৃহীত ছেলে থাকিত। অনুগ্রহকারীর আদেশ নতমস্তকে পালন করা এবং সকল রকম অত্যাচার নির্বিকারচিত্তে সহ্য করাই ছিল অনুগৃহীতদের সর্বপ্রথম কর্তব্য।

অনুগ্রহকারীর বিছানা তৈয়ারি করা, বাইরের কল হইতে সকালবেলা ঘরে জল তুলিয়া আনা, কাপড়চোপড় 'ব্রাশ' করা, এমনকি জুতা পরিষ্কার করা—ইহাই ছিল অনুগৃহীতদের কর্তব্য। কেহ অন্যথাচরণ করিলে কঠোর শাস্তি ঘটিত—রীতিমতো দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। এই সমস্ত ব্যাপার কর্তৃপক্ষেরা জানিতেন এবং অনুমোদন করিতেন।

আত্মরক্ষার মহৎধর্ম প্রতিপদে শিক্ষা দেওয়া হইত। একবার দুজন ছাত্রের মারামারির ফলে একটি ছেলে আহত হইয়া সেইখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হেডমাস্টার কিট খবর শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখেন ছেলেটির দেহে জীবনের আর কোনো চিহ্ন নাই। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'এই আকস্মিক ঘটনায় আমি ক্ষুব্ধ হয়েছি কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার ইটনের প্রত্যেক ছাত্রের আছে—এ-কথাও আমি মানি।' অন্য ছেলেটির কোনো শাস্তি হয় নাই, কারণ সে স্বধর্মই পালন করিয়াছিল—অর্থাৎ আত্মরক্ষা করিয়াছিল।

এমনিভাবে এই ছেলে-গড়া কারখানায় ইংলন্ডের ভবিষ্যৎ নেতারা গড়িয়া উঠিত—এই স্কুলের ছাত্র বলিয়া তাহারা গর্ব করিত এবং এখানকার জীবনযাত্রার মধ্যে কোথাও-যে কিছু অস্বাভাবিকতা আছে, তাহা কোনো ছাত্র মনে করিত না। কিন্তু ক্বচিৎ কখনো এক-একটি

www.pathagar.com

কুসুম-কোমল কিশোর-চিত্ত সহসা এই নিয়মের কারাগারের মধ্যে আসিয়া হাঁফাইয়া উঠিত।

একদিন এই ছেলে-গড়া কারখানায় একটি সুন্দর কিশোর মূর্তির আবির্ভাব হয়। যেন কিশোর দেবতা। প্রভাতের প্রথম আলোর মতো সুন্দর, স্বচ্ছ ও স্ব-প্রকাশ।

কিশোরের পরিচয়—সাসেক্সের ধনী ব্যারন স্যার বিসি শেলির পৌত্র এবং পার্লামেন্টের সদস্য মিস্টার টিমথি শেলির পুত্র পার্সি বিশি শেলি। বাড়ির সংলগ্ন বৃহৎ অরণ্যোদ্যানে আপনার কল্পনার সাথিদের লইয়া কিশোর শেলির শৈশব-দিন অতিবাহিত হয়—ফুলের সঙ্গে কথা কহিয়া, পাখির সঙ্গে গাহিয়া উঠিয়া, আকাশের রঙের সহিত অন্তরের রঙ মিশাইয়া। বনের হরিণ সহসা নগরের রাজপথে আসিয়া পড়িলে যেমন সন্ত্রস্ত, ভীত হইয়া পড়ে, তেমনি ইটনের স্কুলে আসিয়া এই কিশোর ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টি লইয়া সে মূক হইয়া থাকে, তাহার সেই অকাল মৌনতার অন্তরালে বিদ্রোহের বাষ্প জমিয়া ওঠে। বহুদিনের প্রাচীন কারাগারের বাতাসে যেমন নিহত ব্যক্তিদের ব্যথিত আত্মা ঘুরিয়া ফিরে, তেমনি ইটনের সেই নিয়মের কারাগারে বালকের ভয়-বিহ্বল-চিত্তে শত নিষ্পেষিত আকাঙ্ক্ষার ও অন্তরের শত অকাল-হত জিজ্ঞাসার প্রেতস্পর্শ আসিয়া লাগিত। আয়ত চক্ষু দুইটি আকাশের দিকে চাহিয়া বালক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত।

সহপাঠীদের দেখিয়া তাহার ঘৃণা হইত। কমনীয় কোমল দেহ দেখিয়া ইটনের আত্মরক্ষণশীল বালকেরা 'বালিকা' বলিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিত, বড়ছেলেরা অনুগ্রহ দেখাইতে আসিত—বালক অপমানিত বোধ করিত। তাহারা ভয় দেখাইয়া তাহাকে স্বগোত্রে আনিতে চেষ্টা করিত—বালকের কোমল-আনন সহসা অগ্নিকুণ্ডের মতো জ্বলিয়া উঠিত—কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক কোমলতার পরিবর্তে ঝঙ্কার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিত। ইটনের ছেলেরা বুঝিল, এ ব্যাপার সহজ নয়।

কিন্তু স্কুলের প্রাচীরের মধ্যে সেখানকার সর্বজন-সমাদৃত প্রথার এরকম অমর্যাদা ইটনের ছাত্ররা সহিবে কেন? কোনো ছাত্র যখন শেলিকে জল তোলাইতে অথবা জুতা পরিষ্কার করাইতে পারিল না, তখন তাহারা সকলে সম্মিলিতভাবে এই বিদ্রোহীর সামাজিক দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা করিল। পরের জীবনকে দুর্বহ করিয়া তুলিবার যতগুলি কলাকৌশল তাহারা আয়ত্ত করিয়াছিল, একে একে সমস্তই তাহা এই বিদ্রোহীর উপর প্রয়োগ করা হইতে লাগিল।

আপনার মনে মাঠের ধারে কিশোর-কবি প্রিয় কবির কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া পড়িতেছে। পিছন হইতে সহসা চিৎকার উঠিল। অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাদার গোলা আসিয়া কিশোরের সুন্দর অঙ্গকে কর্দম-কলঙ্কিত করিয়া দিল। ক্রোধে অপমানে, বালক চিৎকার করিয়া উঠিল। ছেলের দল তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কেউ পা ধরিয়া টানে, কেউ জামা ধরিয়া টানে, কেউ চুল ধরিয়া টানে, কেউ হাতের বই কাড়িয়া লয়। এই কদর্যতার আক্রমণে তাহার তরুণ-চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিত—জগতের সবকিছুর উপর। দিনের পর দিন এই অত্যাচারে বিদ্রোহের প্রবৃত্তি আরও প্রবল হইয়া ওঠে—সুন্দরের আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হইয়া দেখা দেয়। রাত্রির নির্জনতায় অন্তরের সাথি মিলে—ভল্‌টেয়ার, দিদেরো, গডউইন্! বিদ্রোহী কিশোরের উপাস্য দেবতা, অন্তরের মিতা! রাত্রির মমতাময়ী নির্জনতার মধ্যে তাহারা অপমানিত বিদ্রোহীর কানে আসিয়া বলে : 'মুক্তি আছে সকল বন্ধনের; আনন্দ আছে নিখিল ভুবনে ; ক্ষুদ্র আচার, ক্ষুদ্র প্রথার, ক্ষুদ্র কামনার কারা-প্রাচীরের বাহিরে আছে মুক্ত আত্মার মিলনক্ষেত্র।'

কিশোরকুমার স্কুলে বসিয়া ভাবে সে যেন পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গম—তাহাকে অরণ্যের শ্যাম

www.pathagar.com

নির্জনতার মাতৃবক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্র এক পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে—আর সে প্রাণপণে বদ্ধ দ্বারে ডানার ঝাপট দিতেছে।

একদিন ছেলেরা শেলিকে খেপাইয়া তাড়া করিয়া এক মাঠের শেষে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল। তখন সূর্য অস্ত যাইতেছিল। গলিত স্বর্ণের মতো সন্ধ্যার শান্ত নদী বহিয়া চলিয়াছে। কিশোর সাশ্রুনেত্রে করজোড়ে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে চাহিয়া প্রান্তরের পূর্ণ নির্জনতাকে সাক্ষী রাখিয়া শপথ করিল—হে সুন্দর, এই জীবন তোমাকে উৎসর্গ করিলাম। তোমার পবিত্র মন্দিরের পথে যাহারা কণ্টক-তরু রোপণ করে—আমি তাহাদের চিরশত্রু। শক্তির দাসত্বের উপর তোমার অভিশাপ পড়ুক—ক্ষমতার ব্যাভিচারের উপর তোমার দণ্ড উদ্যত হউক।

সেই শপথ শুনিবার জন্য আকাশে শুধু একটি তারা উঠিয়াছিল।

ছুটির সময় বাড়ি আসিয়া শেলি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিত। শিকল ছিঁড়িয়া বনের পাখি যেন আবার বনে ফিরিয়া আসিত।

বাড়ির চারিদিকের অরণ্য ছিল কিশোরের স্বর্গভূমি। সেখানে বিচরণ করিত শুধু তিনটি কিশোরী মূর্তি আর ইহাদের একক অনুচর শেলি, সেই স্বর্গে আর কেহ ছিল না। সমস্ত বাস্তব জগৎ তাহার নিরুদ্ধ-দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া যাইত। একক দেবতার মতো সেই স্বর্গে শেলি আপনার মনে আপনি সৃষ্টি করিয়া চলিত—যেন সে-ই আদি-স্রষ্টা।

কিশোরী তিনটি সাগ্রহে দিন গুণিত কবে শেলির ছুটি হইবে, সে বাড়ি আসিবে, আবার তাহাদের আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিবে। অবশ্য সবটাই আনন্দের হইত না, কারণ শেলির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির চারিদিকে, বাড়ির বাইরে বনে, বনের মধ্যে গাছের পাতার আড়ালে আড়ালে অদৃশ্য রহস্যলোক হইতে শেলির অন্যান্য অনুচরও দলে দলে আসিয়া জুটিত এবং অন্তরের অনুচর বলিয়া তাহাদের শেলির ভালো লাগিত। কিন্তু কিশোরী তিনটি মাঝে মাঝে এই রহস্যলোকবাসীদের সাহচর্যে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত।

অরণ্যে, বাতাসে, তরু-পল্লবে মর্মরধ্বনি জাগিয়া উঠিত, শেলি কিশোরীদের লইয়া অরণ্যে বাহির হইত। বলিত, তারা আসছে, শুনছ না তাদের পায়ের শব্দ? চোখ বুজিয়া কিশোরীরা শুনিত—অদৃশ্য অপ্সরীর নূপুর-নিক্বণ। কিশোর-কবি ধ্যাননেত্রে দেখিত কুসুম-বিকাশের শুভলগ্নে কল্পলোকবাসিনীদের ছায়ামূর্তি অরণ্যের রৌদ্রছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—পুষ্পবাসে তাহাদেরই অঙ্গ-সুরভি ভাসিয়া আসিতেছে—তাহাদের ছায়া-বসনের আঘাতে বিকশিত কুসুমের দল ছিন্ন হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

সবসময়েই অপ্সরীরা দেখা দিত না। মাঝে মাঝে দুই-একটি দৈত্যও আসিত। অরণ্যের মধ্যে একটা বিরাট গহ্বর ছিল। শেলি জানিত সেখানে এক দৈত্য থাকে—বয়সের তাহার আদি অন্ত নাই, হয়তো সে সময়ের সমবয়সী। শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযুক্ত করিয়া শেলি তাহার আবাহন করিত—ধূমকুণ্ডলী আকাশের দিকে উঠিত, শেলি পুরাকালের পুরোহিতদিগের মতো গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিত : আকাশ-বিহারী হে দৈত্য, তুমি জাগিয়া ওঠো····

অরণ্যের বিরাট শালগাছটি ঝড়ে যখন দুলিয়া উঠিত—তখন শেলি স্পষ্ট একদিন পাতালের রাজাকে সেখানে দেখিতে পাইয়াছিল। সহচরীদের দেখাইবার জন্য তাড়াতাড়ি সেই ঝড়ে বাগানে বাহির হইয়া পড়ে; এবং পরম বিস্ময়ের কথা যে, তাহারা সকলেই দেখিল এক বিরাট পুরুষ

www.pathagar.com

ঝড়ের সঙ্গে দুলিতেছে—ধোঁয়ার মতো তাহার রং, চোখে তাহার বিদ্যুতের দীপ্তি। কিশোরীরা ভয়ে মর্তের দেবতাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। ভীতকণ্ঠে তাহারা জিজ্ঞাসা করে, 'ও কে?'

শেলি উত্তর দেয়, 'ঝড়ের দেবতা। পাতালে তাঁহার সিংহাসন। মাঝে মাঝে যখন আমাদের পৃথিবীতে আসেন তখনই এই তুমুল শব্দ ওঠে, সারা প্রকৃতি দোলে।'

সমস্তই বুঝিতে পারিয়া তাহারা ঘরে ফিরিত। ঘুমাইয়া রাত্রে স্বপ্নে দেখিত—সমস্ত পৃথিবী কালো হইয়া গিয়াছে—কে যেন তাহার গোড়া ধরিয়া নাড়া দিতেছে।

শেলির কল্পনার নন্দনলোকবাসিনী কিশোরী তিনটি তাহার ভগিনী। দুইজন সহোদরা—আর একজন পিতৃব্য-তনয়া। এই তিনজনের মধ্যে শেলি তাহার পিতৃব্য-তনয়া হ্যারিয়েট ও সহোদরা এলিজাবেথকে আত্মার পরমাত্মীয়া বলিয়া জানিত। একই তারার আলোয় এই তিনটি প্রাণীর জীবন বাড়িয়া চলিয়াছিল। একই গডউইন তাহাদের শিখাইয়াছিল যে, এই বাস্তব পৃথিবী অসত্যে আর মিথ্যায় ভরা। সমাজ মানুষকে শত নিয়মের নাগপাশে শুধু পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দরের ধ্যানমন্ত্র ইহারা ভুলিয়া গিয়াছে, তাই যত কুৎসিত নিয়মের শৃঙ্খলে জীবনকে ইহারা বাঁধিয়া রাখিয়াছে। অন্তর যখন অন্তরের সহিত মিলিয়া যায় সেই তো মিলন।

অন্তত এই দর্শনবাদ কিশোর দার্শনিকটি মুগ্ধ শ্রোতাদের শ্রবণে নিত্য ঢালিয়া দিত :

'তারা চায় নিয়ম দিয়ে মানুষের অন্তরের সহজ স্রোতকে বাঁধতে। পাগল আর কী! সুন্দরের ছায়া যখন চোখে এসে পড়ে—হৃদয়ে তখন সহস্র শিখা তো জ্বলে উঠবেই! ভালোবাসা বা না-বাসা কি মানুষের ক্ষমতার মধ্যে? প্রেমের জন্ম চিরমুক্তির কোলে—নিয়মের কারাগার তার শ্মশানভূমি। বিবাহ সেই নিয়মের কারাগার···'

কিশোরীরা একবার সহসা চারিদিকে ফিরিয়া চায়। হ্যারিয়েট সন্দিগ্ধভাবে বলে, 'আচ্ছা নিয়মে কি আসে যায় যদি নিয়মের বাঁধনগুলি তত দৃঢ় না হয়?'

দার্শনিক উত্তর দেয়, 'যদি দৃঢ় না হয়—তবে তার প্রয়োজন কী? কাগজের প্রাচীর দিয়ে কারাগার রচনা তো বিড়ম্বনা।'

'কিন্তু ধর্ম···'

হলবাকের দার্শনিকতত্ত্ব শেলির স্মরণে পড়ে। বলে, 'যদি ঈশ্বর ন্যায়বিচারক হন, কেমন করিয়া আমরা বিশ্বাস করিব বল, যে-জীবকে তিনিই দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, দুর্বলতার দোহাই-এ তিনিই তাহাদের আবার শাস্তি দিবেন? যদি তিনি হন সর্বশক্তিমান, যদি তাঁহারই ইচ্ছা সর্বত্র প্রবল হয়, তাহা হইলে কোনো আঘাত তাঁহাকে স্পর্শ করে না, কোনো বাধা তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করে না। যদি তিনি করুণাময় হন, মানব-অন্তরে বাসনাকে বাসা বাঁধিতে দিয়া তিনি আবার কেমন করিয়া হতভাগ্যকে আঘাত করিতে পারেন?'

'কিন্তু লোকাচার···'

'অনন্তকালের চির-প্রভাতের কাছে—উনবিংশ শতাব্দীর এই ক্ষণিকের আচার আর অনুষ্ঠানের মূল্য কতটুকু?

শেলি আর হ্যারিয়েটের এই তর্কের অন্তরালে কখন আর দুইটি প্রাণী উঠিয়া যায়—তাহা তাহারা লক্ষ করে না।

ম্লান অপরাহ্নের মেদুর আকাশকে ছাইয়া সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামে। পাখিরা নীড়ে ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যার আবরণে কিশোরীর প্রথমে প্রেম-উন্মেষের মতো ফুল ফুটিয়া ওঠে। তাহার মধ্যে দুইটি কিশোর মূর্তি নিবিড় সান্নিধ্যে তন্ময় হইয়া চলে—পৃথিবীর শৈশব-লোকের প্রথম নর ও

www.pathagar.com

নারীর মতো।

১৮১০ সালের অক্টোবর মাসের এক সন্ধ্যাবেলা অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে দুইজন যুবক আপনার মনে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। দুইজনেই দুইজনকে বহুক্ষণ ধরিয়া লক্ষ করিয়াছে, অথচ দুইজনই নির্বাক। দুইজনের মাত্র নামে পরিচয় ; প্রথম যুবকটি শেলি, দ্বিতীয় যুবকটির নাম হগ—শেলির সতীর্থ।

সেদিন বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া কী মনে করিয়া শেলিই প্রথমে আলোচনা শুরু করিল :

'বর্তমান য়ুরোপে জার্মান-কাব্য-সাহিত্যের তুলনা নেই—কি বলেন?'

হগ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কিন্তু জার্মান-কাব্য-সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবধারা বড় যেন ভারী ভারী লাগে—মন ক্লান্ত হয়ে ওঠে—'

'তাহলেও তার গৌরবের অংশীদার বর্তমান য়ুরোপে কেউ নেই—'

'কেন, ইতালিয়ান্ সাহিত্য—'

তর্ক ক্রমশ জটিল হইয়া উঠিল। যৌবনের প্রথম জাগরণের উন্মাদনার প্রবাহে তর্কের সুর পঞ্চমে গিয়া উঠিল। পাঠাগারের দরজা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, তবুও কোনোমতে কেহই তর্ক হইতে নিরস্ত হইবে না।

অবশেষে হগ বলিল, 'আচ্ছা, আমার ঘরে আসবেন—সেইখানেই আলোচনা করা যাবে।'

'তথাস্তু' বলিয়া শেলি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল। ঘরে যাইবার পথে তর্কের সূত্র হারাইয়া যায়। সহসা জার্মান-কাব্য-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ মন্দীভূত হইয়া আসে। ঘরে আসিয়া হগ আলো জ্বালিল। ধীরে সম্মুখের টেবিলে একটি বোতল, দুটি গ্লাস ও কিছু বিস্কুট রাখিল।

হগ তর্ক আরম্ভ করে দেখিয়া শেলি আরাম করিয়া শুইয়া পড়িয়া জানাইয়া দিল যে, জার্মান ও ইতালিয়ান উভয় ভাষাতেই তাহার সমান ব্যুৎপত্তি ; সুতরাং কোনোমতেই আর তর্ক চালানো যাইতে পারে না।

হগও আনন্দে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল, কারণ ইতালিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধে তাহারও জ্ঞান শেলির অপেক্ষা বেশি নয়।

তখন বিজ্ঞানের নব-অভ্যুদয় য়ুরোপকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল ; বিজ্ঞানের মধ্যে রহস্যকে উপলব্ধি করিবার যে নব-আগ্রহ দেখা দিয়াছিল, শেলির অন্তরে তাহার তরঙ্গ আসিয়া লাগে।

বিজ্ঞানের রহস্য-প্রেমিক শেলি বলিয়া উঠিল, 'তাছাড়া সাহিত্যের আলোচনাই কি বৃথা নয়? অতীতের হোক আর বর্তমানেরই হোক, ভাষার অনুশীলনে কী ফল? ও তো শুধু কথা আর তার অসংখ্য পরিভাষা। বস্তু? আসল বস্তুকে জানা—সে কি কম রহস্যময়?'

তারপর এই দুই যুবকের আলাপের মধ্যদিয়া কখন সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তাহা কেহই লক্ষ করে নাই। সহসা শেলি চিৎকার করিয়া লাফাইয়া বলিল, 'ঐ যাহ্, আমার যে ক্লাস আছে!'

আর পিছনে না চাহিয়া শেলি ছুটিল।

পরের দিন সকালে হগ শেলির ঘরে আসিয়া দেখে চাকরের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে। নিত্য ঘর এমন করিয়া রাখিলে তাহার কাজ করা অসম্ভব হইবে—চাকরটির এই অভিযোগ। হগ ঘরে ঢুকিয়াই মনে করিল, কোনো গুদামঘরে যেন আসিয়া পড়িয়াছে। ঘরের মেঝেয় পরম

www.pathagar.com

একতার সঙ্গে বই, পাউরুটির টুকরো, পিস্তল, বারুদ, কাচের যন্ত্র, টিউব, রাসায়নিকের শিশি, একটা ইলেকট্রিক মেশিন, একটা ল্যাম্প—নববৈজ্ঞানিকের নানা প্রকারের আয়ুধ চতুর্দিকে পড়িয়া রহিয়াছে।

ইলেকট্রিকে চা গরম করিয়া করিয়া একটি কাপ টানিয়া গৃহস্বামী যেমন চা ঢালিতে যাইবেন, কাপের ভিতর চাহিয়া সভয়ে অতিথি দেখিতে পাইলেন যে, কাপটির তলায় নাইট্রিক অ্যাসিডে কিছু গলিয়া একটি স্বর্ণমুদ্রা পড়িয়া রহিয়াছে।

এই ঘটনার পর হইতে এই দুইটি যুবকের জীবনের ধারা এক হইয়া গেল। উভয়েই বুঝিল যে পরস্পরকে পরস্পরের প্রয়োজন আছে।

রাত্রিবেলায় মাথার উপরে শুধু আকাশের অনন্ত বন্ধনহীনতাকে সাথি করিয়া শেলি বন্ধুটির কানে অজস্র বকিয়া যাইত—হ্যারিয়েটের কথা, উন্মাদের মতো। আর সেইসঙ্গে সঙ্গে আসিত গডউইনের দর্শন, সমাজতত্ত্ব, বিপ্লবের কথা; হগ বিস্মিত–মনে সেই প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত আর শেলির মনের গুহালোকে প্রবেশ করিতে গিয়া নানাপথে বিভ্রান্ত হইয়া শুধু বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত—রাত্রির পৃথিবী যেমন করিয়া প্রভাতের সূর্যের দিকে চাহিয়া থাকে।

একদিন মিস্টার টিমথি শেলি তাঁহার চিঠির বাক্স হইতে তাঁহারই উদ্দেশে লেখা লন্ডনের একজন প্রকাশকের একখানি চিঠি পাইলেন। চিঠিখানির বক্তব্য হইতেছে যে, উক্ত প্রকাশক মহাশয় তাঁহার পুত্রের লিখিত একখানি 'ভয়ানক' পুস্তকের পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য পাইয়াছে। পুস্তকে যে-সমস্ত জিনিস লেখা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত সামাজিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত এবং একান্ত ভয়াবহ। তাঁহার মতো মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানের যে এইপ্রকার ভয়াবহ ধারণা সব থাকিতে পারে তাহা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছেন। সুতরাং এই পুস্তক প্রকাশ করিবার পূর্বে তিনি ন্যায়ত তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইতে বাধ্য। এবং সেইসঙ্গে জানাইয়াছেন যে, কে একজন হগ বলিয়া ছাত্র তাঁহার পুত্রের মাথায় এই সমস্ত ভয়াবহ ভাব ঢুকাইতেছে।

পত্র পাইয়াই শেলির পিতা প্রকাশক মহাশয়কে জানাইয়া দিলেন যে, যদি তিনি পুস্তক ছাপেন তবে যেন নিজের খরচে ছাপেন। তিনি একটিও পয়সা দিবেন না—পরিশেষে আশ্বাস দিলেন যে, পুত্র বাড়ি আসিলেই তিনি সব বুঝাইয়া শান্ত করিয়া দিবেন।

ছুটির পর শেলি বাড়ি আসিতেই পিতা তাঁহার যুক্তি লইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পিতারা চিরকালই ভুল করেন, যে যুক্তিতে পুত্র কখনও ভোলে না—যদি সে যুক্তি পিতার নিকট হইতে আসে। ফল হইল, শেলি সংসারের সকলের এই চিন্তার পঙ্গুতা ও প্রাণহীনতা দেখিয়া সবার উপর রাগিয়া গেল।

সেদিন রাত্রিবেলা শেলি হগকে লিখিল, 'আমার ধারণা ও মতের জন্য বাড়িতে সকলে আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। আমার বাড়িতে আমি যেন পরিত্যক্তের মতো বাস করিতেছি। আমার পায়ের তলায় আমাকে গ্রাস করিবার জন্য সমুদ্র গর্জন করিতেছে; কিন্তু সে গর্জন দেখিয়া আমার হাসি পায়।....মা মনে করেন, আমি নরকের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি; তাই তিনি সযত্নে হ্যারিয়েট ও আমার ভগ্নীদের আমার নিকট হইতে দূরে দূরে রাখেন।'

শেলি বাড়ির সকলের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিত। সবাই বলে তাহার সমস্ত কথা সমাজদ্রোহিতায় ভরা—এবং পাপ। মানুষ এতদিন যে-সমস্ত জিনিস মানিয়া

www.pathagar.com

আসিয়াছে, আজ একটি ক্ষুদ্র বালক, বিশেষত ধনীর দুলাল তাহার প্রতিবাদ করিবে?

শেলির নন্দনকানন শুকাইয়া আসিল। বোনেরা আর সেরকম করিয়া তাহার সহিত আলোচনা করে না, তাহার কথায় সায় দেয় না। হ্যারিয়েটের মা শেলির সঙ্গে মিশিতে তাহাকে বারণ করিয়া দিয়াছেন। সে আর দেখা করে না। শুধু এলিজাবেথ গোপনে শেলির সঙ্গে কথা বলে এবং শেলির মতে এখনও সায় দেয়। শেলি কলেজ হইতে হ্যারিয়েটকে যে-সমস্ত চিঠি লিখিয়াছিল—তাহা পড়িয়া হ্যারিয়েট বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। শেলি কি উন্মাদ, না তাহাকে প্রতারণা করিতেছে। কিশোরী কেমন করিয়া বিশ্বাস করে যে বিবাহ—পাপ, সমাজবন্ধন—মিথ্যা।

হ্যারিয়েট শেলির সমস্ত চিঠি মাকে দেখায় এবং মা তাহার বাবাকে দেখান। সেই ভদ্রলোক তাহার ভবিষ্যৎ জামাতার পরিচয় পাইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন এবং মেয়েকে শেলির সংশ্রব হইতে দূরে থাকিতে বিশেষ করিয়া আদেশ জারি করিয়া দিলেন।

হ্যারিয়েট ভীত হইয়া একদিন রাত্রে এলিজাবেথকে ডাকিয়া বলিল, 'শেলির সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠতায় কী লাভ! একদিন সে তো জানতেই পারবে যে, আমি কত সামান্য! তার ধারণাকে আশ্রয় দেবার মতো আমার মনের শক্তি কোথায়? নিজেকে দিয়ে সে আমাকে বড় করে তুলেছে—আমি সামান্য একজন মেয়ে বই তো আর কিছু নই।'

এলিজাবেথ শেলিকে সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া বলিতেই শেলি আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ হ্যারিয়েটের নিকটে গিয়া উন্মাদের মতো বলিয়া উঠিল, 'ধর্ম সম্বন্ধে আমার মতের জন্য কি আমি ভ্রাতৃত্ব কিংবা প্রেম থেকে বঞ্চিত হব? এ কেমন যুক্তি।'

হ্যারিয়েট বিহ্বল হইয়া বলে, 'তোমার যা-খুশি তুমি ভাবো আমার তাতে কিছু যায় আসে না—কিন্তু আমার ভাগ্যকে তোমার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলতে আমায় আর অনুরোধ কোরো না।'

জীবনে এই প্রথম শেলি নারীর উদাসীনতার তুহিন স্পর্শ পাইল। শেলি জানিত না যে, কিশোরীর অন্তরে অবহেলা এমনভাবে থাকিতে পারে। তেপান্তরের মাঠের মাঝে যেমন সহসা সন্ধ্যার অন্ধকার আসিয়া ভ্রান্ত পথিককে বিহ্বল করিয়া তোলে তেমনি বিহ্বল হইয়া শেলি হ্যারিয়েটের মুখের দিকে চাহিল—মানবী প্রহেলিকা হইয়া উঠিল।

তখন রাত্রির অন্ধকারে বাহিরে তুহিন পড়িতেছিল। কাহাকেও কিছু না-বলিয়া শেলি সেই তুহিনপাতের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল। গ্রামের প্রান্তে যেখানে বসিয়া তাহাদের প্রেমের ফুল প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেইখানে গিয়া উন্মাদ কিশোর-প্রেমিক বসিয়া রহিল।

ভোরবেলা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া এক শিশি বিষ লইয়া কিশোর শুইতে গেল। বিছানায় শুইয়াই এলিজাবেথের মুখ মনে জাগিল। সহসা মনে হইল, তাহার মৃতদেহ দেখিয়া এলিজাবেথ কি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে! এলিজাবেথের ব্যথার সম্ভাবনায় সেদিন শেলির আত্মহত্যা করা হইল না।

সকালে উঠিয়া শেলি হগকে চিঠি লিখিল, 'মহাকালকে সাক্ষ্য রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জীবনে কোনোদিন পরমত-অসহিষ্ণুতাকে আমি ক্ষমা করিব না। ...তুমি জানো না আমার মতের জন্য সে আমায় ঘৃণা করে ... আমার সমস্ত অন্তর ভাঙিয়া গিয়াছে ...যদি কোনোদিন এই ব্যথাকে রূপ দিতে পারি সেদিন জানিবে আমি আজ কতখানি আঘাত পাইয়াছি ...'

শেলির ছুটির দিন ফুরাইয়া আসিতেছিল। হ্যারিয়েট আর তাহাদের বাড়ি আসে না। শেলি

www.pathagar.com

শুনিল হ্যারিয়েটের অন্যত্র বিবাহের কথা হইতেছে এবং শেলি দেখিল যে একদিন সত্যসত্যই অন্যত্র হ্যারিয়েটের বিবাহ হইয়া গেল।

কলেজে ফিরিয়া আসিয়া আপনার মতকে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করিবার মানসে শেলি বই লিখিতে বসিয়া গেল। চিন্তার এই পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেই হইবে। 'নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা' নামে এক পুস্তিকা লিখিয়া নিজের পয়সায় তাহা ছাপাইয়া বিক্রয়ের জন্য অকসফোর্ডের প্রধান পুস্তক-বিক্রেতার দোকানে জমা দিয়া আসিল। পুস্তিকায় লেখকের স্বাক্ষররূপে নাম রহিল জেরামিয়া স্টকলি।

কুড়ি মিনিট যাইতে-না-যাইতে সেই পথ দিয়া অকসফোর্ডের বিখ্যাত ধর্মযাজক রেভারেন্ড জন ওয়াকার যাইতেছিলেন। দোকানের নূতন পুস্তকের বিজ্ঞাপনীর দিকে নজর পড়িতেই সহসা পুস্তকের নাম দেখিয়া তিনি প্রকাশক মহাশয়কে ডাকিয়া ব্যাপারখানা কী জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রকাশক সন্ত্রস্ত হইয়া জানাইল যে, তাহারা এখনও পুস্তকটির বিষয় কিছু জানে না, লেখক সবেমাত্র উহা দোকানে জমা দিয়া গিয়াছে।

ধর্মযাজক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'জানবার প্রয়োজনই বা কী—নামেতেই তো প্রকাশ!'

ধর্মযাজক মহাশয় স্পষ্ট ভাষায় আজ্ঞা দিলেন যে, এখনই ঐ নামধেয় যত পুস্তক আছে সমস্ত সযত্নে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলা হউক, নতুবা অনর্থ ঘটিবে।

আইনত এইরূপ আজ্ঞা দিবার কোনো অধিকার রেভারেন্ড ওয়াকারের ছিল না। কিন্তু প্রকাশক জানিত যে তিনি ইচ্ছা করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-বিষয়ে একটা আন্দোলন করিতে পারেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহানুভূতির উপরই তাহার ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং অপরাধ স্বীকার করিয়া লওয়া এবং তাহার আশু প্রতিকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। তৎক্ষণাৎ শেলিকে ডাকিয়া আনিয়া প্রকাশক বুঝাইয়া দিলেন যে অকসফোর্ডে ঐ পুস্তক বিক্রয় করা চলিবে না। অতএব যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া...

বাধা পাইলে পার্বত্য নির্ঝরিণীর সফেন গতিবেগ যেমন আরও বর্ধিত হয়, এই নিদারুণ প্রত্যাখ্যানে শেলি আরও ক্ষিপ্ত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া ছদ্মনামের পাশে স্বহস্তে নিজের নাম লিখিয়া একখানি করিয়া পুস্তক ইংলন্ডের আর্কবিশপ হইতে আরম্ভ করিয়া অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনকে পর্যন্ত পাঠাইয়া দিল।

দুইদিন যাইতে-না-যাইতেই শেলির ঘরে আসিয়া দরওয়ান জানাইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন তাহাকে ডাকিয়াছেন, শীঘ্রই যাইতে হইবে।

ডিনের ঘরে ঢুকিতেই তিনি অত্যন্ত কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এসব বুঝি তোমার কীর্তি?'

প্রশ্নকর্তার ভঙ্গি দেখিয়া শেলি রাগে নিরুত্তর হইয়া রহিল এবং কোনো উত্তর দিবে না ঠিক করিল।

'উত্তর দাও, তুমি এই বইয়ের গ্রন্থকার কিনা?'

'যদি প্রমাণ করিতে পারেন ওটা আমার লেখা তবে সে-সমস্ত প্রমাণ দেখান। আর তা যদি না পারেন তাহলে আমাকে ওরকমভাবে প্রশ্ন করা অন্যায়। এই ধরনের প্রশ্ন শুধু মধ্যযুগে শোভা পেত—সভ্যতার সঙ্গে এ মোটেই খাপ খায় না।'

'তুমি কি বল এ তোমার লেখা নয়?'

www.pathagar.com

'আমি এরকম প্রশ্নের কোনো উত্তর দিব না।'

'আচ্ছা, তবে তাই দিও না। কিন্তু এখনি কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে যাও।'—এবং তৎক্ষণাৎ একখানি ছাড়পত্র সহি করিয়া শেলির হাতে দেওয়া হইল।

রাগে ও অপমানে কাঁপিতে কাঁপিতে শেলি বন্ধুর নিকটে আসিয়া জানাইল, 'তাড়িয়ে দিয়েছে—'

ব্যক্তিগত অপমান ব্যতীত এই ব্যাপার যে কতদূর গড়াইতে পারে, তাহা দুই বন্ধুই বুঝিল। অতঃপর পড়াশোনা সব বন্ধ হইয়া যাইবে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আর ছাত্ররূপে গ্রহণ করিবে না, বাড়িতে হয়তো পিতাও আর প্রবেশ করিতে দিবেন না। কিন্তু তাহা হউক—তবুও যে-মানুষ শিক্ষিত বলিয়া গর্ব করে, সে কেন এইরকমভাবে মানবের চিন্তার স্বাধীনতাকে অপমান করিবে? আর কেনই বা সে মাথা পাতিয়া তাহার অনুজ্ঞা মানিয়া লইবে?

হগ আনুপূর্বিক ব্যাপার শুনিয়া বন্ধুর অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ কলেজের কর্তৃপক্ষের নামে একখানি চিঠি লিখিয়া জানাইল যে, তাঁহার বন্ধু যে কতবড় একজন গুণী লোক তা তাঁহারা জানেন না। এবং এই অন্যায় বিচারে তাঁহাকে যথেষ্ট অপমান করা হইয়াছে। হয়তো কর্তৃপক্ষগণ পুনরায় বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

পুনর্বিচারের ফল ফলিতেও দেরি হইল না। আর এক ছাড়পত্র তৎক্ষণাৎ হগের নামে আসিয়া পৌঁছিল।

সেইদিন রাত্রেই কুড়ি পাউন্ড ধার করিয়া দুই বন্ধু লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করিল। লন্ডনে আসিয়া বাড়ি খোঁজার পালা পড়িল। কোনো বাড়িই পছন্দ হয় না; হয় ভাড়া বেশি, নতুবা অন্ধকার, নয় বড্ড গোলমাল। সহসা পোলান্ড স্ট্রিটে আসিয়া পড়াতে—পোলান্ডের নামের সঙ্গে পোলান্ডের স্বাধীনতার সমরের কথা স্মরণে পড়িল। দুই বন্ধু একসঙ্গে ঠিক করিল যে, লন্ডনে থাকিতেই যদি হয়—তবে এই পোলান্ড স্ট্রিটেই।

মনের মতো একটি বাড়িও পাওয়া গেল। দুই বন্ধু ঠিক করিল, আর কোথাও না—এইখানেই তাহারা থাকিবে—কিন্তু আপাতত থাকা নির্ভর করে পিতা মহাশয়ের দয়া ও দাক্ষিণ্যের উপর। দুই বিদ্রোহী যুবক পথে পিয়নের দিকে চাহিয়া রহিল—দিশাহারা নাবিক যেমন স্থলের দিকে চাহিয়া থাকে।

পিয়ন যথাসময়ে আসিল। টাকার পরিবর্তে আসিল একখানি চিঠি : 'যদিও তোমার ব্যাপার আমি বুঝিতে পারিয়াছি এবং তোমার চিন্তার গ্লানির অংশ আমাকেও ভুগিতে হইতেছে, কিন্তু এ-কথা জানিবে যে আমার নিজের নিকট আমার একটা কর্তব্য আছে, আমার ধর্মবিশ্বাসের প্রতিও আমার একটা কর্তব্য আছে।

অতএব যদি তুমি ভবিষ্যতে আমার আশ্রয়ে অথবা কোনোরকম সহায়তার আশা রাখ, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তোমাকে পুরামাত্রায় পালন করিতে হইবে—

১. যথাসম্ভব সত্বর বাড়ি ফিরিয়া আসা এবং তোমার বন্ধু হগের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ না-রাখা।

২. অতঃপর আমি তোমাকে যাহার তত্ত্বাবধানে রাখিব তাহার কথামতো চলিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলে জানিবে যে, তোমার সহিত আমার কোনো সম্বন্ধ নাই। ইতি—

টিমথি শেলি'

www.pathagar.com

প্রত্যুত্তরের বিলম্ব হইল না—ফেরত-ডাকেই পিতার নিকট পুত্রের উত্তর গেল : 'আপনি যখন পরম অনুগ্রহ করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ কার্যবিধি পরিচালনায় আমার মতামতের উপর নির্ভর করিয়াছেন, তখন আপনার কর্তব্যবুদ্ধিতে আঘাত লাগিলেও আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনার পত্রের কোনো শর্ত আমি মানিতে রাজি নই এবং ভবিষ্যতে যদি কখনও আবার এইরকম কোনো শর্ত আসে আপনি নিশ্চিত জানিবেন, তাহারও ভাগ্য ঐরূপ হইবে।

আপনার অনুগ্রহে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। ইতি—

আপনার স্নেহার্থী বিনীত (?)
শেলি'

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধের মধ্যে পুত্রের বিদ্রোহের তীব্রতা অনেক সময় রূঢ়ভাবে থাকে; কিন্তু পিতার বিদ্রোহের তীব্রতার অন্তরের স্নেহদুর্বল হৃদয়ই কাঁপিতে থাকে—যতক্ষণ না তাহা আঘাতে নির্জীব হইয়া যায়।

উত্তর পাইয়া সাক্ষাৎভাবে পুত্রের সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য টিমথি শেলি লন্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিকটস্থ হোটেলের ভৃত্য দ্বারা যুবক দুইটিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। দুই বন্ধুতে সন্ধ্যাবেলায় হোটেলে আসিয়াই শুনিলেন যে, তাহাদের জন্য টিমথি অপেক্ষা করিতেছেন।

অবজ্ঞা ও জয়ের হাসি দুই বন্ধুর অধরে ফুটিয়া উঠিল। সে হাসি পিতার কর্ণে গিয়া পৌঁছিল এবং তাহার অর্থ যে কী তাহা বুঝিতেও পিতার দেরি হইল না।

টিমথি শেলি হগকে আলাদা ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি তো দেখছি একটু গোছালো, শেলিকে নিয়ে কী করি বল তো—ও বড্ড দুর্দান্ত, না?'

'তা একটু।'

'কী করি বল তো—তুমি তো ওর মনের খবর রাখ।'

'দেখুন, আমার মনে হয়, এই—হ্যারিয়েটের সঙ্গে যদি ওর—ওকে চালাবার মতো যদি কোনো মেয়ে পাওয়া যায়—'

এমন সময় শেলির আবির্ভাবে কথাটা অন্যদিকে মোড় ফিরিয়া গেল।

টিমথি শেলি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয় আলোচনা আরম্ভ করিলেন। এবং সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন :

'সকালবেলা আসার সময় এই কথাগুলো মনে আসতে লিখে রেখেছিলাম।'

শেলি গম্ভীরভাবে বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, 'ওসব কথা কোথায় পড়েছি বল তো? ঠিক ঐসব কথা—ওহ্ পেলির বইতে না—'

পাণ্ডিত্য ধরা পড়িয়া যায় দেখিয়া টিমথি শেলি রাগিয়া উঠিলেন। বচসা ক্রমশ বাড়িয়া চলিল। অবশেষে কোনো মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক, পিতা-পুত্রের মতান্তর বিবাদে পরিণত হইল। পিতা-পুত্রের মিলনের পরিণাম এই হইল যে, পিতা পুত্রকে একটি কপর্দকও দিবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া গেলেন।

টিমথি শেলি চলিয়া যাইবার পর একদিন হগের পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হগ শেলি নয়। সেইজন্য হগের পিতাকে বিশেষ কোনো পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইল না। নাস্তিক বন্ধুকে

www.pathagar.com

অবিশ্বাসের অন্ধকারে একা ফেলিয়া রাখিয়া হগ পিতার ঈশ্বরের অনুসন্ধানের পথে চলিয়া গেল। বিপুল নগরীর মধ্যে শেলি সেই প্রথম নির্জনতাকে আর এক নূতনরূপে দেখিতে পাইলেন। জীবনের মূল-গ্রন্থী যখন জগতের যাত্রাপথ হইতে সহসা ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন ব্যথামুখে রক্ত ঝরিয়া পড়িলেও সে-ব্যথার মধ্যেও আনন্দ-দেবতার সিংহাসন লুকাইয়া থাকে।

কিন্তু যত দিন যায় জীবনের এই আকস্মিক নির্জনতা ততই ভয়াবহ হইয়া ওঠে। শেলি যাহাকে নির্জনতা বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা তো নির্জনতা নয়—সে নির্বাসন। কোনো কাজ না-থাকায় যত শীঘ্র সম্ভব শেলি নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কোথা হইতে সেই নিদ্রাহীন-অন্ধকার সহসা জনাকীর্ণ হইয়া উঠিত; শেলির অন্তর অস্ফুট, অশ্রান্ত কলধ্বনিতে ভরিয়া যাইত। সেই বোনদের মুখ, সেই হ্যারিয়েটের পাষাণপ্রতিমা! অশান্তভাবে কিশোর-কবি শয্যা হইতে উঠিয়া বিনিদ্র চাঁদকে সাথি করিয়া রাত্রি জাগিয়া কাটাইত। বাহিরে ম্লান চন্দ্রালোকে নিঃশব্দে পাতার উপরে আকাশ শিশির-অশ্রুতে গলিয়া পড়িত; আপনার একান্ত নির্জনতায় কবির হৃদয় হইতে বেদনার বাণী জাগিয়া উঠিত, সেও অশ্রুতে ভরা।

যে-দুঃখ মানুষের সৌন্দর্যবোধকে আঘাত করে না—তাহাকে সহ্য করার মধ্যে একটা অহমিকার অনন্দ আছে, কিন্তু যে-দুঃখ মানুষের চারিদিকে অবশ্যম্ভাবী কদর্যতার সৃষ্টি করে—তাহাকে বড় করিয়া দেখার মধ্যে মানুষের মনের ফাঁকি ব্যতীত আর কিছু নাই।

আসল কথা শেলির পয়সা ফুরাইয়া আসিল—ফুরাইয়া যাওয়াই তাহার স্বধর্ম। একপাত্র চায়ের অতিরিক্ত বাসনা পরিপূর্ণ করিবার ক্ষমতা ইংলন্ডের ভবিষ্যৎ কবিপ্রতিভার সেদিন ছিল না। ওধারে পিতারও সাড়াশব্দ নাই।

হাতের কাছে কোনো কাজ নাই, কোনো কাজের সম্ভাবনাও নাই—অর্থ নাই, বন্ধু নাই, কাহারও অন্তরের সহানুভূতিও নাই। আপনার একান্ত নির্জনতার অন্ধকারে কিশোর-কবি শুধু অন্তরের নিরুদ্ধ বেদনাকে অশ্রুনিবিড় ছন্দে রূপ দেয়।

সকলেই এক সমাজদ্রোহী বিপ্লবীকে ভুলিয়াছিল—ভুলিতে পারে নাই শুধু তাহার ভগ্নীরা। বড়বোন এলিজাবেথ কিছু করিতে পারিত না—কারণ তাহাকে সর্বদাই চোখে চোখে রাখা হইত—যাহাতে কোনো উপায়ে তাহার চিত্ত আর তাহার সহোদরের অকল্যাণ-স্পর্শ না পায়। কিন্তু ছোটবোনেরা সেই সময় বাড়ি ছাড়িয়া মিসেস ফেনিং নামক একজন শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'অ্যাকাডেমিতে' বাস করিত। তাহারা সহোদরকে ভুলিতে পারে নাই। হাতখরচের জন্য বাড়ি হইতে যাহা পাইত, গোপনে তাহা তাহারা শেলিকে পাঠাইয়া দিত।

ক্রমশ শেলি মিসেস ফেনিং-এর স্কুলে আসিয়া ভগ্নীদের সহিত দেখা করিতে লাগিল। ভগিনী এবং ভগিনীদের বন্ধুদের লইয়া সেইখানেই শেলি নূতন করিয়া আসর গড়িয়া তুলিতে লাগিল। যে নব্য-দর্শন তাহাকে আজ গৃহহারা করিয়াছে, সুন্দরের যে ধ্যানমন্ত্র আজ তাহার সাথিহীন যৌবনের নির্জনতাকে অব্যক্ত বেদনার ভারে বিড়ম্বিত করিয়া তুলিয়াছে পুনরায় তাহা অপরের নিকট প্রকাশ করিতে পাইয়া শেলি অন্ধকারে যেন আলোকের দেখা পাইল। তরুণী শ্রোতাদের পুলকিত বিস্ময়ের সহিত তরুণ বিপ্লবীর আবেগের সংমিশ্রণে মিসেস ফেনিং-এর আশ্রমে যে অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল, তাহাতে শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া সহসা সচকিত হইয়া উঠিলেন। শেলির পিতা যথাসময়ে কুলদ্রোহী পুত্রের এই নূতন কীর্তির সংবাদ পাইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া তিনি মিসেস ফেনিংকে জানাইয়া দিলেন যে, কোনোক্রমেই ভবিষ্যতে

www.pathagar.com

যেন শেলি তাহার ভগ্নীদের সহিত আর দেখাসাক্ষাৎ না করিতে পারে।

মিসেস ফেনিং-এর স্কুলে যাওয়া শেলির বন্ধ হইল। কিন্তু ভগিনীরা ভ্রাতার অনশন আশঙ্কায় তাহাদের এক তরুণী বন্ধুর হাত দিয়া অর্থ পাঠাইতে লাগিল। তরুণীটির নাম হ্যারিয়েট ওয়েস্টব্রুক—ভগিনীদের সহপাঠী, তরুণ বিপ্লবীর ভক্ত।

মানসচক্ষে দেখিতে পাইতেছি একটি তরুণী চলিয়াছে—গোপনতার লজ্জায় চরণ ভারাক্রান্ত। এক নিরুদ্ধ গৃহের রুদ্ধদ্বারে কম্পিত হস্তে সে মৃদু করাঘাত করে—নয়নে তাহার জ্যোতির্শিখা, প্রণয়-ভীরুতার আবেগে ঈষৎ কাঁপিতেছে—বক্ষের স্পন্দনকে সংযত করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় তনুলতা-বেপথু। রুদ্ধদ্বার গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া তরুণ কবি দেখে—এ কী অপরূপ আবির্ভাব। দুয়ারে দাঁড়াইয়া নারী করুণাময়ী। বক্ষের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ভগিনীর স্নেহের দান নিঃশব্দে সে ভ্রাতাকে পৌঁছাইয়া দেয়। বিমূঢ় মুহূর্তে হয়তো উভয়ের ওষ্ঠ হইতে অর্ধোচ্চারিত কী কথা স্খলিত হইয়া পড়ে—এত যুগের ব্যবধানে তাহা আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। ত্রস্ত চরণে তরুণী চলিয়া আসে। শেলির অন্তর গাহিয়া ওঠে, 'অন্তরের ছায়াবন-বিহারিণী তুমি কি এলে?' এমনি প্রায়ই তরুণীকে আসিতে হয়। প্রথম দর্শনের মৌন বিস্ময় ক্রমশ অন্তরঙ্গতায় মুখর হইয়া ওঠে! শেলি হ্যারিয়েটকে আগাইয়া দেয়। ক্রমশ উভয়ের দেখাসাক্ষাতের জন্য কোনো প্রয়োজনকে আর উপলক্ষ করিতে হয় না।

হ্যারিয়েট বাড়িতে সকলকে শেলির কথা বলিয়াছিলেন। বাড়িতে শুধু বাবা আর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী এলিজা। শিশুকালে মাতৃহারা হওয়ায় বড়বোন এলিজাই হ্যারিয়েটকে মানুষ করে এবং সংসারের কর্তৃত্বের অবসরে কখন তাহার সঙ্গীহীন জীবনের ত্রিশটি বসন্ত নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছে—তাহা সে লক্ষ করে নাই। দেখিতে সুন্দর না হইলেও এলিজাকে কুৎসিত বলা চলে না, কিন্তু অতৃপ্ত যৌবন তাহার দেহে ও মনে একটা কঠোর রুক্ষতার অভিশাপ আঁকিয়া দিয়াছে। হ্যারিয়েটের বাবা ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরে—কিছু অর্থসংস্থান করিতে পারিয়াছিলেন এই মাত্র। তাঁহার ইচ্ছা ছিল ছোটমেয়েটিকে লেখাপড়া শিখাইয়া সম্ভ্রান্ত ঘরে বিবাহ দিবেন। তাই কন্যার মুখে তিনি যখন সেই অপূর্ব-চরিত্র শেলির কথা শুনিলেন তখন তিনি কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সেই দেখাসাক্ষাতে কোনো বাধা দিতে চাহিলেন না। বড়বোন এলিজা হ্যারিয়েটের মুখে নিত্য সেই অদ্ভুত যুবকের অলৌকিক সমস্ত গুণের পরিচয় পাইত এবং আপনার বঞ্চিত ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া ভগ্নীর সৌভাগ্যের সম্ভাবনার পথে উৎসাহিত করিতে লাগিল। যেদিন হ্যারিয়েটের সহিত শেলির দেখা হয়, হ্যারিয়েট বাড়িতে আসিয়া নিভৃতে এলিজাকে সমস্ত বলে—বলিতে বলিতে প্রেমবিহ্বলতায় সর্বাঙ্গ তাহার কাঁপিয়া ওঠে: 'আপলো—অলিম্পিয়াসের দেবতা।'

মিস্টার ওয়েস্টব্রুক যখন বাড়ি থাকিতেন না, এলিজার পরামর্শে শেলি তাহাদের বাড়ি আসিত—আপনার রচিত মন্দার-কাননে স্বর্গের দেবতার মতো আবার শেলি আত্মার সহোদরা হ্যারিয়েটের সহিত নব নব ভাবের কল্পলোক সৃজন করিত। হ্যারিয়েটের স্ফুটনোন্মুখ চিত্ত নব-সূর্যোদয়ে বিকশিত হইয়া উঠিত।

কিন্তু এই ব্যাপার কিছুদিন পরেই মিসেস ফেনিং-এর শ্রুতিগোচর হইল এবং তিনি যাহা শুনিলেন তাহা তাহার স্কুলের ছাত্রীর পক্ষে সম্ভব হইল কী করিয়া, ভাবিতেই তিনি আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ক্রমে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীরাও শুনিল যে হ্যারিয়েট গোপনে.....

www.pathagar.com

মিসেস ফেনিং একদিন হ্যারিয়েটকে ডাকিয়া শাসাইয়া দিলেন, 'তোমার বয়স অল্প—জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নাই—তাই তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি—ঐ ছেলেটি অত্যন্ত ভয়ানক ছেলে; ওর যেমন আদর্শ, চরিত্রও ঠিক তারই অনুরূপ—অতএব ভবিষ্যতে যেন তোমার সম্পর্কে এ-সমস্ত কথা আর না শুনি।'

একদিন স্কুলের মেয়েরা হ্যারিয়েটের বইয়ের ভিতর শেলির লেখা একখানা চিঠি পাইয়া গেল। সারা স্কুল তোলপাড়—চিঠিতে যে-সমস্ত ভয়াবহ কথা লেখা ছিল তাহা পড়িয়া শিক্ষয়িত্রী হইতে ছাত্রীরা পর্যন্ত সকলে শিহরিয়া উঠিল এবং তাহার পর হইতে হ্যারিয়েটের স্কুলজীবন নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ও গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল। একটা ঘোরতর নাস্তিক, সমাজদ্রোহী, বিবাহকে যে কুসংস্কার বলে—তাহার সঙ্গে প্রেম!

একদিন রাত্রিবেলা শেলি একাকী আপনার ঘরে বসিয়া আছে, এমন সময় এলিজার নিকট হইতে একখানি চিঠি আসিল। চিঠিতে লেখা—হ্যারিয়েট অত্যন্ত অসুস্থ, তোমাকে দেখতে চায়—এক্ষুনি এস।

শেলি কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ ওয়েস্টব্রুকদের বাড়িতে আসিল। এলিজা দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল—সে শেলিকে উপরে হ্যারিয়েটের শয্যাপার্শ্বে লইয়া আসিল।

মৃদু দীপালোকে হ্যারিয়েটের ম্লান মুখখানি যেন আরও সুন্দর লাগিতেছিল। এমন সময় বাহিরে পদশব্দ হইল। মিস্টার ওয়েস্টব্রুকের আগমন-সম্ভাবনায় শেলি একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। যতই সংস্কারমুক্ত তাহার চিত্ত হউক, যাঁহার গৃহে এবং যাঁহার কন্যার পার্শ্বে এমনি নিশীথে সে উপবিষ্ট, তিনি কী মনে করিবেন ভাবিয়া শেলি বিচলিত হইয়া উঠিল।

মিস্টার ওয়েস্টব্রুক ঘরে ঢুকিয়া শেলিকে আনন্দিত অন্তরে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। শেলি প্রত্যভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

'তোমাদের সঙ্গে বসে একটু আলাপ করতে পারলে ভালোই ছিল—কিন্তু নিচে কয়েকজন অতিথি বসে আছেন—আমি একটু নিচে যাই—' বলিয়াই মিস্টার ওয়েস্টব্রুক নিচে চলিয়া গেলেন।

শেলি নীরবে হ্যারিয়েটের কুঞ্চিত কেশে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিলেন। এলিজার আজ কথা বলিবার সাধ গিয়াছে—সে আপনার মনে প্রেম, সমাজ, ধর্ম ও নীতি সম্বন্ধে অবিশ্রান্ত বকিয়া চলিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে বিরক্তির স্বরে হ্যারিয়েট অনুযোগ করিল, তাহার ভয়ানক মাথা ধরিয়াছে—কথা ভালো লাগিতেছে না।

এলিজা কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। 'তাইতো, আমার কাজ রয়েছে সব পড়ে—আমি ভুলেই গিয়েছি।'—বলিয়া সেও চলিয়া গেল।

মৃদু দীপালোকে দুটি প্রাণী সেদিন কী কথা কহিয়াছিল—শুধু মধ্যরাত্রির চন্দ্র ছায়াপথে দাঁড়াইয়া তাহা শুনিয়াছিল।

পরের দিন কিন্তু হ্যারিয়েটের অসুখের আর কোনো চিহ্ন রহিল না।

হ্যারিয়েটের প্রেমে শেলির নির্বাসন আবার সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পিতার নির্মম উদাসীনতা তাহার চারিদিকে এক ভয়াবহ দৈন্যের অন্ধকার সৃষ্টি করিতেছিল। অর্থাভাব ব্যতীত, এলিজাবেথের কথা তাহার চিত্তকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিত। সে কেমন আছে? এখন সে কী

www.pathagar.com

ভাবে? একদিন উন্মুখ-কৈশোরে যে ভাব ও ভাবনার বীজ সে নিজহস্তে তাহার অন্তরে রোপণ করিয়া আসিয়াছে—গৃহের বন্ধনের মধ্যে তাহা কেমন অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। যতই এলিজাবেথের কথা ভাবে ততই শেলির বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। কী হয়, যদি সহসা সে একদিন বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হয়?

পিলফোর্ড বলিয়া শেলির একজন মামা ছিলেন। তিনি নেলসনের অধীনে সেনানায়কের কাজ করিয়াছিলেন। সমুদ্রবিহারী বীর-সৈনিক—সংস্কারের প্রতিদিনের ওজন-করা নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা প্রাণশক্তিকে বেশি বুঝিতেন। তাই দুর্বৃত্ত ভাগিনেয়ের ব্যাপার শুনিয়া তিনি মনে মনে তাহাকে ভালোবাসিতেন। শেলি সহসা একদিন মামার নিকট হইতে সাদর আমন্ত্রণ পাইল। সহসা এই সহানুভূতির স্পর্শে কালবিলম্ব না করিয়া কার্কফিল্ডে মামার বাড়িতে গিয়া উঠিল। সাক্ষাৎ-দর্শনে ভাগিনেয়ের কথাবার্তা শুনিয়া বীর-সৈনিক একেবারে এই যুবক বিদ্রোহীর ভক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাহার প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবিধানের জন্য তিনি কৃতসংকল্প হইলেন।

পিলফোর্ড অভিজাত-গৌরবীদের মনস্তত্ত্ব ভালোরকম জানিতেন। তাই তিনি প্রথমে ডিউক অব নরফোককে ধরিলেন। ডিউকের কথায় অবশেষে পিতা পুত্রকে ক্ষমা করিলেন এবং বাৎসরিক দুইশত পাউন্ড অর্থসাহায্যের স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। পিলফোর্ডের সহিত শেলি পুনরায় ফিল্ডপ্লেসে স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে আসিবার শেলির একমাত্র প্রেরণা ছিল—এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করা। এলিজাবেথের সহিত দেখা হইল—কিন্তু শেলি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল এলিজাবেথের পরিবর্তন দেখিয়া। শেলিকে আর সে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। শেলি পুরাতন কথার আলোচনা করিতে যায়—এলিজাবেথ হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, তাহাকে টিটকারি করে। অভিজাতশ্রেণীর একান্ত সাধারণ মেয়েদের মতো আপনার বিলাস-ব্যসন, ছোটখাটো কথা, ঝগড়া, কুৎসা লইয়াই সে তৃপ্ত। ফিল্ডপ্লেসে থাকিতে শেলির মন হাঁফাইয়া উঠিতেছিল। সেখানকার বায়ু প্রতিমুহূর্তে তাহার যেন শ্বাস-রোধ করিতেছিল। কয়েকদিন ফিল্ডপ্লেসে থাকার পর শেলি এক দূর-আত্মীয়ের আহ্বানে র‍্যাডনরশায়ারে চলিয়া গেল।

ওধারে হ্যারিয়েটের জীবন ভিতরে-বাহিরে অসহ হইয়া উঠিতেছিল। শেলির অকস্মাৎ অন্তর্ধানে এবং মিসেস ফেনিং-এর বিরামহীন চেষ্টায় মিস্টার ওয়েস্টব্রুক স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আশা সৎপাত্রে বর্তায় নাই। ব্যারনের পৌত্র, সে কেন গৃহস্থের মেয়ে বিবাহ করিতে যাইবে? কন্যার সহিত শেলির দেখাসাক্ষাতের অনুমোদন করায় তিনি যে কী ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা যতই বোঝেন, ততই তাঁহার আক্রোশ গিয়া পড়ে হ্যারিয়েটের উপর।

পিতার মনোভাব বুঝিয়া কন্যা দিনদিন শুষ্ক ও বিমর্ষতর হইয়া উঠিতে লাগিল। কন্যার বিক্ষিপ্ত অন্তরকে পরিশুদ্ধ ও সংযত করিয়া তুলিবার জন্য মিসেস ফেনিং-এর পরামর্শে মিস্টার ওয়েস্টব্রুক হ্যারিয়েটকে একজন ধর্মযাজকের তত্ত্বাবধানে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন।

প্রবাসে সহসা শেলি হ্যারিয়েটের এক পত্র পাইল। পত্রে লেখা : 'জীবনে কী লাভ? চারিদিকে এর শৃঙ্খল বাজে। যার জীবনে কাহারও কোনো প্রয়োজন নাই—আত্মহত্যা কি তার পক্ষে পাপ?'

শেলি চিঠি পাইয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহারই প্রত্যেক কথায় তো এই মেয়েটির জীবন

www.pathagar.com

গড়িয়া উঠিতেছে—সেই তো তার আত্মার অভিভাবক। নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া শেলি হ্যারিয়েটের পিতাকে এক উপদেশপূর্ণ দীর্ঘ পত্র লিখিল। পত্র পাইয়াই বৃদ্ধ এই অনধিকার-চর্চায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।—অর্বাচীনের আস্পর্ধা!

শেলি পুনরায় আর-একখানি পত্র পাইল। বন্ধনের ক্রন্দনে ভরা! পত্রের আবেদন : যাহার জন্য বন্ধনের জ্বালা—তাহার হাতে কি মুক্তির উপায় নাই? প্রেমই যদি নিত্য ও চরম সত্য হয়—অপরের আশ্রয়কে ছাড়াইয়া তাহার কি থাকিবার শক্তি নাই!

শেলির সমস্ত মন দুলিয়া উঠিল! এই বিপুল ধরায় কি দুটি প্রাণীর স্থান হইবে না?

কালবিলম্ব না করিয়া শেলি লন্ডনে চলিয়া আসিল। গোপনে হ্যারিয়েটের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বিরহ-বিশীর্ণা কল্পলোকের অপ্সরী! শেলি রুদ্ধকণ্ঠে কিশোরীর কানে কানে শুধু বলিয়াছিল—'ওরা তোমায় কষ্ট দিয়েছে—না?'

কিশোরী বলিয়াছিল—'না, ওরা তো কষ্ট দেয় নি। হে সুন্দর দেবতা, আমার প্রেমই আমার চরম ব্যথার কারণ!'

হ্যারিয়েটের পিতা শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিলেন। তাই যৌবনের দীপ্তশিখাকে তিনি ভাবিয়াছিলেন সংযমের বাধ্যবাধকতা দিয়া মেদুর করিয়া তুলিবেন। ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন তাহা। কিন্তু যে-দেবতা সৃষ্টির অন্তরালে বসিয়া গ্রহে গ্রহে, তৃণে তৃণে, ফলে ফুলে, নারীর অধরে, তনুভঙ্গিতে, যৌবনের অন্তরের অন্তস্তলে সৃষ্টির সুমহান বাসনা জাগাইয়া তোলে—সে-দেবতার সংহিতা আর পিতার অনুশাসন বড়ই পৃথক।

তাই একদিন এক গোধূলি-লগ্নে একটি কিশোর ও আর একটি কিশোরী নিঃসহায়, নিঃসম্বল ভাবে, সবার গোপনে, শুধু অন্তরের দেবতাকে সাক্ষ্য রাখিয়া বিপুল পৃথ্বীর পথে বাহির হইয়া পড়িল। যে-দেবতা সহস্র ভুলের কণ্টক দিয়া একটি ব্যথার অপরূপ নীলোৎপল সৃষ্টি করেন—সেই দেবতার জয় হইল, সেই দেবতার জয় হউক।

প্রবাহিণী দুকূলপ্লাবিনী

দুঃসাহসিক প্রেমিকদের জগৎ সাক্ষাৎভাবে নিন্দা করিলেও গোপনে ভালোবাসে। তার উপর তাহারা যদি সুন্দর হয় তাহা হইলে তো কথাই নাই।

এডিনবরা শহরে যে-বাড়িতে আসিয়া তাহারা দুইজনে আশ্রয় লইল, সেই বাড়ির গৃহস্বামী ব্যাপারটা গুরুতর বুঝিয়াও বাড়ির দুখানি সবচেয়ে ভালো ঘর ছাড়িয়া দিল। এবং ব্যারনের বংশধর শুনিয়া কিছু অগ্রিম টাকা দিতেও দ্বিধাবোধ করিল না। গৃহস্বামী স্বয়ং ঘাড় পাতিয়া বিবাহের সমস্ত হাঙ্গামারও ভার লইল। মাত্র একটি শর্তে যে, বিবাহের দিন আশেপাশের ভদ্রলোকদের প্রীতিভোজ দিতে হইবে। ইহাই প্রথা, নহিলে নিন্দা হইবে।

বিবাহের রাত্রে কোনোরকমে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ সাঙ্গ করিয়া শেলি যখন বাড়িতে আসিল তখন তীব্র স্কচ্ হুইস্কির গন্ধে সমস্ত বাড়ি ভরিয়া গিয়াছে। শেলির মনের গহন বনে যে সলাজ রক্তকুসুম তখন ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার গন্ধের সহিত ইহার কোনো সদ্ভাব ছিল না।

শেলি ও হ্যারিয়েট বাড়িতে পদার্পণ করিতে-না-করিতেই কতকগুলি মাতাল কোনোরকমে

www.pathagar.com

টলিতে টলিতে আসিয়া সরস ভাষায় নবদম্পতিকে অভিবাদন জানাইল। হ্যারিয়েটের সুন্দর মুখখানি লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। দলের মধ্যে যাহার ভাষা জোগাইয়া উঠিতেছিল না, সে ভঙ্গি দিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতেছিল। শেলি তাহার বিবাহের আসর কখনো এইরূপ কল্পনা করিতে পারে নাই।

হ্যারিয়েটের শরীর অসুস্থ বলিয়া শেলি কোনোরকমে নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট বিদায় লইয়া উপরে আপনার ঘরে গিয়া সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক বিকট হাস্যধ্বনি নিচে ধ্বনিয়া উঠিল...

মুক্ত বাতায়নপথ দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছিল—অপ্সরীর ক্রীড়া-অঙ্গন।

শেলি হ্যারিয়েটের দিকে চাহিল—তাহারও চোখে সেই আকাশের গভীর নীলিমা—সুন্দরের ক্রীড়া-অঙ্গন।

এমন সময় দরজায় মৃদু করাঘাত হইল, ক্রমান্বয়ে হইতে চলিল। শেলি দরজা খুলিতেই দেখিল সমস্ত নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া গৃহস্বামী উপস্থিত। প্রত্যেকের হাতে পরিপূর্ণ পাত্র।

কোনোরকমে জড়িতকণ্ঠে গৃহস্বামী নৈশ-আক্রমণের হেতু বিজ্ঞাপন করিবার জন্য বলিল, 'এখানকার প্রথা যে মধ্যরাত্রে বধূকে হুইস্কি দিয়ে স্নান করাতে হয়, তাই—'

অধিক আর কিছু বলিবার অবকাশ না দিয়া শেলি পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, "এক পা যে এই দরজার মধ্যে দেবে তার মাথার খুলি এক-মুহূর্তে উড়ে যাবে।'

লোকগুলি চমকাইয়া উঠিল, ভয়ে না রসভঙ্গে তাহা অবশ্য বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে যেমন তাহারা আসিয়াছিল সেইরকমভাবে পূর্ণপাত্র হাতে করিয়া ফিরিয়া গেল। এতখানি কমনীয়তার মধ্যে এতখানি উত্তাপ যে থাকিতে পারে—তাহা তাহারা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই।

ক্রমশ রাত্রি আরও সুগভীর হইয়া আসিল। পরিপূর্ণ নির্জনতা দুইটি প্রেমিক-হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত সুগভীর অবকাশ রচনা করিয়া দিল। তাহারই মধ্যে প্রেমের নিশিগন্ধা ফুটিয়া উঠিল—সংগোপনে, সন্তর্পণে...

প্রেমের ফুল ফোটে নির্জনে কিন্তু তাহার পরিতৃপ্তি নির্জনতাকে লইয়া নয়। প্রেম বহুলোকের মধ্যে নির্জনতাকে চাহে। রাধিকার প্রেম চাহে ললিতাকে, যমুনার তীরে মাধবীলতার কুঞ্জভবনের নির্জনতাকে সুমধুর করিয়া ছাইয়া আছে সখি ললিতার অকস্মাৎ আবির্ভাবের সম্ভাবনা।

শেলির মনে হইল, এই সময় যদি তাহার অন্তরের মিতারা সকলে থাকিত, তাহা হইলে এই মর্ত-ভুবন মন্দার-কানন হইয়া উঠিত। সকলে মিলিয়া এই রুগ্ণ, পঙ্গু, সৌন্দর্যজ্ঞানহীন পৃথিবীর মধ্যে একটি আদর্শ আনন্দভবন রচনা করিয়া যাইত, যাহার প্রেরণায় একদিন জগৎ শত বাধাবন্ধনের নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দজ্যোতির্লোকে পরিণত হইত।

যে-প্রেম হ্যারিয়েটকে কেন্দ্র করিয়া শেলির সমস্ত চৈতন্যকে মগ্ন করিয়া ছিল, জগতের কল্যাণ-আদর্শে অনুপ্রাণিত ভাবরসিক কবি চাহিয়াছিল তাহা যেন উভয়ের আসক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া একটা বিরাট ভাবযজ্ঞের পূত হোমাগ্নি হইয়া ওঠে। ধরণীর সমস্ত ব্যথা ভাবতান্ত্রিক কবির চিত্তে প্রেমের এক অভিনব দায়িত্বের সৃষ্টি করে। মানবচিত্তের সমস্ত দুঃখ-হরণের মহাদায়িত্ব যেন তাহারই।

হ্যারিয়েট বিমূঢ় বিস্ময়ে শেলির মানব-ত্রাণ পরিকল্পনার সমস্ত অদ্ভুত কল্পনার কথা শ্রবণ

www.pathagar.com

করিত এবং অধিকাংশ সময় সমস্ত ব্যাপার না-বুঝিয়াই সে শেলির কথাই স্বীকার করিয়া লইত। সেই অতল সমুদ্রের ভাবাবর্তের মধ্যে জলবিন্দুর মতো সে মিশিয়া গেল। কিন্তু কিছুদিন যাইতে-না-যাইতে হ্যারিয়েটের এই বিমূঢ়তা শেলির ভালো লাগিল না। তাই বিশ্ব-সংস্কারের প্রথম উদ্যম আসিয়া পড়িল হ্যারিয়েটের উপর। প্রেমিকা শিষ্যা হইল। শেলি চাহিয়াছিল যে, হৃদয়ের সহচরী তাঁহার ভাব-নায়িকা হইবে—নিত্য ভাবের প্রেরণায় তাহার চিত্তকে জাগাইয়া তুলিবে। সে-নারী রূপের অপরূপ স্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে চেতনার নব নব দ্বার খুলিয়া দিবে—মানসলোকে যে-সৃষ্টির বীজ এখনো অঙ্কুরিত হয় নাই তাহারই জননীত্বে তাহা অকস্মাৎ হয়তো প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে।

তাহাদের সহিত যোগদান করিবার আহ্বান করিয়া শেলি বন্ধু হগকে চিঠি লিখিল। হগের সহিত ছাড়াছাড়ি হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও শেলি সর্বদাই হগকে চিঠিতে সকল কথা জানাইত এবং হগও পত্রের মধ্যদিয়া পুরাতন বন্ধুত্ব জিয়াইয়া রাখিয়াছিল।

সহসা একদিন দরজায় আবার করাঘাত হইল। শেলি দরজা খুলিতেই দেখে—ব্যাগ হস্তে স্বয়ং হগ। আনন্দে চিৎকার করিয়া দুই বন্ধু দুইজনকে আলিঙ্গন করিল। শেলি তৎক্ষণাৎ গৃহস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিপুল উৎসাহের সহিত জানাইল যে, তাহার আর একখানি ভালো ঘর চাই—এবং এক্ষণই চাই। শেলির উৎসাহের প্রেরণায় গৃহস্বামী আপনার একখানি ঘর ছাড়িয়া দিল। শেলি হগের সহিত হ্যারিয়েটের আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিল। হ্যারিয়েটের যৌবনোদ্ভাসিত রূপ-লাবণ্য দেখিয়া হগ সহসা বিমুগ্ধ হইয়া গেল।

পরের দিন বিকালবেলায় তিনটি প্রাণী মেরিস্টুয়ার্টের স্মৃতি-ভবন পরিদর্শনে বহির্গত হইল। হগের আবির্ভাবে হ্যারিয়েটও উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। হ্যারিয়েট কলেজে যে খুব মন দিয়া ইতিহাস পড়িয়াছিল—দুই বন্ধু সেদিন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইল। সেই হতভাগ্য সম্রাজ্ঞীর সকরুণ জীবনের কথা হ্যারিয়েট অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইয়া আসে—হ্যারিয়েটের বাড়ি ফিরিবার নাম নাই। বেড়াইতে তাহার ভালো লাগিতেছিল। দরকারি কাজ থাকায় অগত্যা হ্যারিয়েট ও হগকে রাখিয়া শেলি বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যার রক্ত-আলোয় হ্যারিয়েটকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। দুরন্ত বাতাসের আলোড়নে হ্যারিয়েট আপনাকে সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হ্যারিয়েটের পরিপূর্ণ দেহে বাতাসের এই দুরন্তপনা হগ লক্ষ করিতেছিল। লক্ষ করিতে তাহার ভালো লাগিতেছিল।

এইরকম অবস্থায় ছয় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কিন্তু অর্থসমস্যা পুনরায় মাথা তুলিয়া দেখা দিল। হগ যাহা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে। শেলির পিতা পুত্রের অভিনব কীর্তির কথা জ্ঞাত হইয়া বাৎসরিক সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তবে পিলফোর্ড মাঝে মাঝে বিদ্রোহী ভাগিনেয়টিকে কিছু কিছু সাহায্য পাঠাইতেন।

হগকে ইয়র্ক নগরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। শেলি ঠিক করিল হগের সহিত তাহারাও যাইবে। একদিন এক গাড়িতে তিনটি মূর্তি ইয়র্ক শহরের দিকে রওয়ানা হইল। পথে হ্যারিয়েট অবসর বিনোদনের জন্য পরমানন্দে একখানি অতি প্রাচীন ধরনের নভেল উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া শোনাইতেছিল। শেলি মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ছিল।

'এই সমস্ত বইখানা কি শুনতে হবে?'

'নিশ্চয়ই!'

www.pathagar.com

'মাঝে মাঝে কিছু বাদ দিয়ে যাও না—'

'তা কি হয়!'

ইয়র্ক শহরে আসিয়া শহরটি শেলির মোটেই ভালো লাগিল না। এ-ধারে পকেট একেবারে শূন্য। শেলি ঠিক করিল মামার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিবে এবং আসিবার সময় হ্যারিয়েটের বাসনা অনুযায়ী জ্যেষ্ঠা এলিজাকেও সঙ্গে লইয়া আসিবে। আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়াই সেই অজানা শহরে প্রিয়তম বন্ধুর আশ্রয়ে হ্যারিয়েটকে রাখিয়া শেলি চলিয়া গেল।

দুইটি প্রাণী বিচিত্র উপায়ে পরস্পর পরস্পরকে একান্ত কাছে পাইল।

এই নিরঙ্কুশ একাকিত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া হগ আপনার মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত, শেলিকে শতরকমের গালাগালি দিত কিন্তু আত্মনিরোধের সকল চেষ্টার মধ্যদিয়া হগ দেখিল তাহার দেহ ও মন হ্যারিয়েটের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই অশোভন ব্যাপারের জন্য সে একমাত্র শেলিকে দায়ী করিল। হগ নিজের মনকে বুঝাইল যে, শেলি হ্যারিয়েটের প্রেমের অপমান করিয়াছে—তাহা না হইলে এইরকমে ফেলিয়া যাইতে পারে?

পরের দিন সন্ধ্যাবেলা দুইজনে নদীর ধারে বেড়াইতে গেল। হগ অবিশ্রান্ত বকিয়া যাইতেছিল—অধিকাংশ সময় নিরর্থকভাবে। হ্যারিয়েটও বকিতেছে—শেলি কখন ফিরিয়া আসিবে—সঙ্গে তাহার দিদিকে লইয়া আসিবে। আর এলিজার যেমন রূপ, তেমনই গুণ! কালো কালো, ঘন ঘন চুল—একমাথা ভরা বুদ্ধি! হ্যারিয়েটের জীবনের সমস্ত জটিল সমস্যা সে-ই তো সমাধান করিয়া দিয়াছে।—

হগ হাসিয়া বলিল, 'শিশুদের জীবনে আবার সমস্যা আছে নাকি?'

হ্যারিয়েট সেসব কথায় কান না দিয়া আপনার মনে বলিয়া যাইতে লাগিল—তাহার স্কুল জীবনের অতীত কথা—শেলির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ—ঘরে বাইরে সে কী নির্যাতন—আত্মহত্যার কথা তার প্রায়ই মনে হইত।—

হ্যারিয়েট সহসা হগকে প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা, তুমি কি কখনো আত্মহত্যা করবার কথা ভাব নি?'

'না—'

'আমি প্রায়ই ভাবতাম। স্কুলে কতদিন গভীর রাতে জেগে উঠে সত্যি সত্যি ভেবেছি আত্মহত্যা করব। আকাশের চাঁদের কাছে বিদায় নিতাম, ঘুমন্ত পৃথিবীর কাছে বিদায় নিতাম, ... তারপর বিছানায় গিয়ে ঘুমের ঘোরে শুয়ে পড়তাম—'

সেদিন বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া হগ কোনোরকমে মনকে কশাঘাত করিয়া ঘুমাইতে গেল। পরের দিন সকালে উঠিয়াই হগ হ্যারিয়েটের পদতলে প্রেম-নিবেদন করিল।

হ্যারিয়েট এই আকস্মিক অভিযানে একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িল। আত্মসম্বরণ করিয়া হ্যারিয়েট হগের এই দুর্বিনীত ব্যবহারে তাহাকে তীব্র তিরস্কার করিল। হগ বাধা পাইয়া লজ্জিত হইল।

—'আশা করি ভবিষ্যতে তুমি আর কোনোদিন এরকম ব্যবহার করবে না। আমিও শেলিকে এ বিষয় কিছু জানাব না!'

সন্ধ্যাবেলা একা যখন হগ বাড়ি ফিরিল তখন দেখে রুক্ষদেহী আর-এক নারী উপস্থিত।

হ্যারিয়েট পরিচয় করাইয়া দিল, ইনি এলিজা—আমার দিদি আর এই হগ—শেলির প্রিয়তম

www.pathagar.com

বন্ধু! এলিজা মাত্র ঘাড় তুলিয়া একবার অভিবাদন করিল—তারপর অন্যত্র উঠিয়া গিয়া হ্যারিয়েটের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। হগ ক্ষুব্ধ হইল।

এলিজার আবির্ভাবে বেদুইনদের সংসারে যেন একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এলিজা সংসারের সমস্ত ভার নিজের স্কন্ধে লইয়া সংসার গোছাইতে লাগিয়া গেল। সবার উপর তাহার রাগ হইল শেলির কাণ্ডকারখানা দেখিয়া। এইরকম অবস্থায় সে হ্যারিয়েটকে একটা অসভ্য যুবকের সঙ্গে একা ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই কি তাহার ভালোবাসা?

হগ বুঝিতে পারিয়াছিল যে এলিজা তাহাকে দেখিতে পারে না। এলিজাকেও সে দেখিতে পারিল না। হ্যারিয়েটের সহিত বেড়ানো আর সম্ভব হয় না। বাধা পাইয়া হগের কামনাকুল চিত্ত আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল। একদিন এলিজা কী কাজে ব্যস্ত থাকায় হ্যারিয়েটকে একলা পাইয়া সে জ্ঞাপন করিল যে, তাহাকে না পাইলে সে আত্মহত্যা করিবে—

হ্যারিয়েট হাসিয়া উঠিল! সে হাসির অর্থ হগ বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, 'তোমার হাসিটি কী মধুর ছন্দে ভরা—'

অকস্মাৎ সেইদিন রাত্রেই শেলি ফিরিয়া আসিল। কোথাও কিছুই সুবিধা হয় নাই। এলিজাদের বাড়িতে আসিয়াই শুনিল এলিজা তাহার অপেক্ষা না-করিয়াই চলিয়া গিয়াছে। মামার কাছে গিয়া শুনিল পিতামহাশয় বলিয়াছেন, 'শেলিকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করা অপেক্ষা—আমার যদি শত জারজ পুত্র থাকত তাদের ভরণপোষণ করা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করি।' এই অপূর্ব যুক্তির কোনো সঙ্গতি আছে কিনা বুঝিতে না পারিয়া শেলি বাড়ি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এই কয়দিনের অসাক্ষাতের পর বাড়ি ফিরিয়া তাহার যেন সব নূতন বোধ হইতে লাগিল। কোথায় কী যেন একটা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার জন্য এই কয়েকটি চিরন্তন যাযাবরের জীবন যেন সহসা থমকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শেলির মনকে সবচেয়ে বেশি পীড়া দিল যখন সে দেখিল যে, হ্যারিয়েট আর সেরকমভাবে হগের সহিত কথা বলে না—কেমন একটা অবজ্ঞার ভাব। রাত্রে দুইজনে মিলিত হইলে শেলি হ্যারিয়েটকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়াই বলিল, 'আচ্ছা, তুমি হগের সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার কর কেন? ও আমাদের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু—' হ্যারিয়েট মৃদু হাসিয়া বলিল, 'সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, বটেই তো—'

হ্যারিয়েটের কথার সুরে বিস্মিত হইয়া শেলি জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন?'

হ্যারিয়েট আদ্যোপান্ত ঘটনা শেলিকে বলিল। সমস্ত ঘটনা শুনিয়া শেলির সর্বশরীর ঝিমাইয়া আসিল।

হ্যারিয়েট বলিল, 'সে কী বলে জানো? শেলি নারীর প্রেমের মর্যাদা বোঝে না—সে শুধু প্রেমের তত্ত্ব আলোচনা করে; আর তাছাড়া এতে শেলির ক্ষতি কী? সে কোনোদিন না-জানলেই হল! সে তোমার স্নেহেই সন্তুষ্ট থাকবে—কিন্তু তোমার প্রেম—'

শুষ্ক বেতস বনের মধ্যদিয়া সহসা বায়ু-আন্দোলনে যেমন একটা আকস্মিক ক্ষীণ স্বর জাগিয়া উঠে—তেমনিভাবে শেলি বলিয়া উঠিল, 'সে এসব কথা বলেছিল সত্যি?'

'এ শুধু নয়, তোমার সম্বন্ধে সে আরও অনেক কথা বলেছিল। তুমি শুধু তোমার ভাব-রূপ নিয়েই আছ—বাস্তবের বিচ্যুতিতে তোমার মনের কোনো অনিষ্ট হবে না—'

সহসা শেলির মনে হইল যে তাহার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে সমস্ত পৃথিবী সরিয়া গিয়াছে! এক বিরাট কুহেলিকার সমুদ্রে শুধু তাহার মন ঘুরিয়া মরিতেছে।

www.pathagar.com

শেলি ধীরে ধীরে উঠিয়া হগকে ডাকিল। শেলির চেহারা দেখিয়া হগ সমস্ত ব্যাপারই বুঝিয়াছিল এবং তাহার জন্য সে প্রস্তুতও ছিল।

দুই বন্ধুতে বাড়ি ছাড়াইয়া নদীর ধারে গিয়া বসিল। মাথার উপরে সন্ধ্যার ম্লান চাঁদের রেখা। শেলি ধীর শান্তভাবে কথা উত্থাপন করিল। হগ কিছুই গোপন করিল না।

'নারীর সৌন্দর্য আমাকে উন্মাদ করে দেয়। তাই নিরুপায় হয়ে আমি—'

ছায়ালোকের কবি সেদিন শান্তভাবেই বলিয়াছিল, 'প্রেম নয়, ও কামনা। ও তো আলো নয়—শুধু ধূম। প্রেম কী, হয়তো আজও বোঝ নি বন্ধু! প্রেম আত্মতৃপ্তির জন্য কোনোদিন প্রেমাস্পদের দুঃখ-গ্লানি আনতে পারে না। তুমি হ্যারিয়েটকে সেই গ্লানিতে ফেলেছ—আর আমাকে এই ঘটনা জানাবার আগে আমি পূর্ণ যৌবনের অধিকারী ছিলাম—আর আজ আমার মনে হচ্ছে আমার মধ্যদিয়ে একটা শতাব্দী চলে গেছে—"

লজ্জায় ও ক্ষোভে হগ তখন শেলির গায়ের উপর পড়িয়া গিয়াছে। কোনোরকম ক্লান্তকণ্ঠে সে বলিল, 'আমাকে ক্ষমা কর, বন্ধু, নূতন করে জীবন আরম্ভ করবার অবকাশ থেকে বঞ্চিত কোরো না—'

ঊর্ধ্ব আকাশের চাঁদের স্তিমিত প্রদীপের দিকে চাহিয়া ছায়ালোকের কবি বলিল, 'সে সুবিধা তোমার চিরকালই রইল। কিন্তু আমি পাপকে ঘৃণা করি। চিরদিনই করব। যেদিন সত্য সত্যই তোমার কৃতকর্মের গ্লানি কতদূর তা বুঝতে পারবে—সেদিন যেন আমার মনে এ ঘটনার কোনো স্মৃতিচিহ্ন থাকবে না। মানুষ কী ছিল, তাই দিয়ে শেলি মানুষকে বিচার করে না।'

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া শেলি দেখিল, এলিজা জিনিসপত্র গুছাইতেছে। 'ও-রকম লোকের সহিত এক-মুহূর্তও থাকা উচিত নয়।'

পরের দিন সকালবেলা হগ উঠিয়া দেখে শূন্যগৃহে সে একা পড়িয়া আছে।

শেলির সাধ গিয়াছিল, বিখ্যাত লেক-প্রদেশে গিয়া থাকিবে—সেখানকার মুক্ত-প্রকৃতির মধ্যে চিরকাল আপনাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে। যে-সমস্ত কবি আপনাদের অমর সুর দিয়া লেক-প্রদেশকে ধন্য করিয়াছেন—হয়তো তাঁহাদের সহিত দেখা হইবে—শেলির আত্মা তাহার কল্পনার সহচরদের সত্য মূর্তিতে দেখিতে পাইবে।

হয়তো দেখিবে সন্ধ্যা-ধূসর পথে, ড্যাফোডিল-কুসুম-বিকীর্ণ পথ দিয়া, মাথায় অস্তরবির বিদায়-আলোর আশীর্বাদ লইয়া প্রথম-জাগা তারাটির দিকে চাহিয়া কবি চলিয়াছে। নয়নে তাহার তারার রহস্য-কথা, গতিতে তাহার কোন্ অজানা ছন্দ ফুটিয়া ওঠে; হয়তো দেখিবে হ্রদসৈকতে শিশিরের জন্মতিথি উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া রূপসুধা পানে বিভোর কবি হ্রদসৈকতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! হয়তো দেখিবে ...

শেলি দেখাও পাইল! ইংলন্ডের রাজকবি সাদের সহিত তাঁহার দেখা হইল। হ্রদসৈকতে নয়, প্রথম-জাগা তারার আলোয় নয়, সন্ধ্যা-ধূসর পথেও নয়। সাদের ঘরে—চেয়ার, টেবিল, আসবাবপত্রের প্রাচুর্যের মধ্যে, অতি সাধারণ জীবনের অতি জঘন্য আত্মতৃপ্তির মধ্যে। কবির মানসী-প্রিয়ার সহিতও দেখা হইল—

কাব্যের সুমেরু শিখরে যে-সমস্ত ছায়াময়ী লাবণ্য ঘুরিয়া বেড়ায়—যাহাদের সন্ধানে শেলির মন বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—এ তো তাহাদের সহচরী নয়। সামান্য একজন স্ত্রীলোক, বেশি-মাইনে-পাওয়া একজন পরিচারিকার মতো। রাত্রিদিন রান্নাঘর বাজার আর আসবাবপত্র লইয়া আছে—ছোট ছোট কথা—ছোট ছোট ত্রুটি-বিচ্যুতির সমষ্টি মাত্র। অতি সাধারণ

www.pathagar.com

জীবনযাপনের একটা আত্মতৃপ্তির দম্ভে ভরা।

সাদের সহিত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে শেলি আপনার আদর্শের কথা বলিয়া যাইতেছিল—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর অন্যমনস্কভাবে সাদে বলিয়া উঠিল—'ওসব আমিও দেখে যেতে পারব না—তুমিও পারবে না।'

সাদের গৃহিণী শেলির গৃহস্থালি গুছাইবার ভার লইলেন—এলিজার ভালো লাগিল না। সাদে স্বয়ং শেলির মনকে গড়িয়া তুলিবার ভার লইলেন—শেলির তাহা ভালো লাগিল না।

সহসা সেই সময় একখানা কাগজে শেলি সাদের একটি প্রবন্ধ দেখিতে পাইল। তাহাতে সাদে ইংলন্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় জর্জের অযথা প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, 'এত বড় রাজা আর কখনো ইংলন্ডের সিংহাসনে বসে নাই।' সেই প্রবন্ধ পড়িয়া শেলি রাজকবির মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় পাইল—তাহাতে একেবারে খেপিয়া উঠিল এবং কালবিলম্ব না করিয়া দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সাদেকে চিঠি লিখিয়া জানাইল যে, অতঃপর তাহাকে কবি বলিয়া না-জানিয়া বৃত্তিভোগী সামান্য দাস বলিয়া সে জানিবে—একজন পাপের প্রশ্রয়দাতা, অর্থের স্তবকারক—

লেক-প্রদেশের কবির মানসমূর্তি শেলির মন হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু লেক-প্রদেশ তেমনি রহিল—তেমনি রহস্যময়। তেমনি সন্ধ্যায় আর একজন তরুণ-কবি তাহার নির্জন পথে ঘুরিয়া ফিরে, উদয়তারার সাথি সে—অস্ততারার মিতা।

শেলিরা যেখানে থাকিত, তাহারই অনতিদূরে ডিউক অব নরফোক বাস করিতেন। শেলির পিতা টাকাকড়ি পাঠানো বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং পিলফোর্ডের নিকট হইতে সামান্য যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে সংসার চলা দুরূহ হইয়া উঠিল। শেলি ঠিক করিলেন যে তিনি ডিউক অব নরফোকের সহিত একবার দেখা করিবেন। উক্ত মর্মে শেলি তাঁহার নিকট একটি পত্রও লিখিলেন।

ডিউক অব নরফোক একবার মধ্যস্থ থাকিয়া শেলির জন্য একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে এই গৃহপরিত্যক্ত বিপ্লবীটির প্রতি তাঁহার কেমন একটি মমতা জন্মাইয়া গিয়াছিল। শেলির পত্রের উত্তরে তিনি সমাদরে শেলিদের সপরিবারে তাঁহার প্রাসাদের নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লিখিলেন।

ডিউকের বাড়িতে তিনটি যাযাবর প্রাণী যথেষ্ট সমাদর পাইল। হ্যারিয়েটের কথাবার্তা ও রূপ দেখিয়া ডিউক-পত্নী বিস্মিত হইয়া গেলেন। ডিউক পুনরায় শেলির পিতাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া পুত্রের অর্থের বন্দোবস্তের জন্য পত্র লিখিলেন।

ওধারে মিস্টার ওয়েস্টব্রুক যখন শুনিলেন যে তাহার মেয়ে ও জামাই ডিউকের বাড়িতে সম্মানিত অতিথি হইয়াছেন, তখন সহসা তিনি উদার হইয়া পড়িলেন এবং পত্র দ্বারা জামাতাকে জানাইলেন যে, তিনি অতঃপর তাহাদের বাৎসরিক দুশো পাউন্ড করিয়া দিবেন।

শেলির পিতাও ডিউকের ভর্ৎসনা ফিরাইয়া দিতে পারিলেন না। তিনিও তাঁহার প্রতিশ্রুত অর্থসাহায্য নিয়মিতভাবে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন।

কিন্তু অর্থসাহায্য পাইয়াও দুর্বিনীত পুত্র পিতাকে পত্র দ্বারা জানাইল, 'এই সাহায্য পাইয়া আমি যতদূরই উপকৃত হই না কেন, এ-কথা আমার আপনাকে জানানো কর্তব্য যে, এই অর্থমূল্যে আমি আমার মতো বিক্রয় করিতে অসমর্থ।'

ক্রুদ্ধ পিতা উত্তরে জানাইলেন—'আমি তোমাকে টাকা পাঠাইতেছি, পাছে তুমি আমাদের বংশের দোহাই দিয়া অপরিচিত লোকদের ঠকাইয়া জীবিকা নির্বাহ কর বলিয়া।'

www.pathagar.com

সাদের পরিচয়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া শেলি পুনরায় তাঁহার অন্তরের গুরু গডউইনের দিকে ফিরিয়া চাহিল। এবার শেলি সোজাসুজিভাবে আত্মপরিচয় দিয়া একান্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গডউইনকে এক দীর্ঘপত্র লিখিল। এবং সেই পত্রে তাঁহাকে গুরু বলিয়া শেলি আপনাকে সমাজ বিপ্লবের আদর্শ প্রচারক গডউইনের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

এইখানে গডউইনের ঈষৎ পরিচয় প্রয়োজন। তাঁহার রচিত *Political Justice* তখন ইংলন্ডে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেছিল। এই পুস্তক রচনার জন্য গডউইনকে কারারুদ্ধ করিবার কথা ওঠে কিন্তু তখনকার প্রধানমন্ত্রী পিট অনেক বিবেচনার পর স্থির করেন যে, গডউইনকে শাস্তি দিয়া অথবা উক্ত পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিয়া গডউইনের আদর্শকেই আরও তুলিয়া ধরা হইবে; যেহেতু, খুব অল্পসংখ্যক লোকই সেই বই কিনিয়া পড়িবে কারণ তাহার মূল্য ছিল ছয় গিনি। আর ছয় গিনি ব্যয় করিয়া সেই বই কিনিবার মতো যাহাদের অর্থসামর্থ্য আছে, তাহাদের চিত্ত গডউইনের আদর্শে সহসা বিচলিত হইবে না।

গডউইন জীবন আরম্ভ করেন ধর্মযাজকরূপে। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সেই তিনি গির্জার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নাস্তিকতা প্রচার করিতে থাকেন। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁহার রাজনৈতিক আদর্শ। সামাজিকভাবে বিবাহকে তিনি কুসংস্কার বলিয়া প্রচার করেন। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে গডউইন তাঁহার প্রচারিত আদর্শগুলি তাঁহার জীবনে বিপরীত দিক দিয়াই সফল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বিবাহকে কুসংস্কার বলিয়া প্রচার করিলেও গডউইন প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পরই দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন এবং এই দুইবার বিবাহের ফলে তাঁহার সংসার বিচিত্রভাবে বহু সন্তানসন্ততির মিলনক্ষেত্র হইয়া ওঠে।

গডউইনের প্রথম স্ত্রী ইংলন্ডের বিখ্যাত বিদুষী মহিলা মেরি উলস্টোনক্রাফট। উলস্টোনক্রাফট ও গডউইনের বিবাহের ফলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাহার নাম মেরি। উলস্টোনক্রাফট কুমারী অবস্থায় ক্যাপ্টেন গিলবার্ট ইমলি নামক একজন আমেরিকানের প্রতি প্রেমাসক্ত হন এবং এই প্রেমের ফলে সামাজিক দণ্ডের কলঙ্ক-তিলক লইয়া ফ্যানি ইমলি জন্মগ্রহণ করে এবং সেও এই পরিবারে লালিত-পালিত হয়। দ্বিতীয় বিবাহের ফলে গডউইন আর একটি পুত্র-সন্তান লাভ করেন এবং সেইসঙ্গে তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীটিও সঙ্গে করিয়া নূতন সংসারে তাঁহার পুরাতন সংসারের স্মৃতিস্বরূপ একটি কন্যা ও একটি পুত্র লইয়া আসেন। কন্যাটির নাম জেন। পুত্রের নামের এখানে কোনো প্রয়োজন নাই। এইরূপ বিচিত্র নরনারী সমাবেশের সহিত গডউইনের বিপ্লবতত্ত্বের সংমিশ্রণে পরিবারটি একটা বৃহৎ রোমান্সের ক্ষেত্র হইয়াছিল।

মেরি, জেন ও ফ্যানিকে উচ্চশিক্ষিত করিবার জন্য গডউইনের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু আর্থিক অনটন এবং এইরূপ বিচিত্র নরনারী সমাবেশের দরুন পারিবারিক অশান্তির ফলে তাঁহাকে তাঁহার আদর্শবিচ্যুত হইয়া অর্থের সঙ্গতির জন্য আভিজাত্যের দ্বারে দাক্ষিণ্যের-যে প্রসাদ ভিক্ষা করিতে হইত না, তাহা নয়। এরকম সময়ে যখন একজন ভবিষ্যৎ কবিপ্রতিভা এইরূপভাবে তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিল, তখন গডউইনের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তিনি পত্রযোগে শিষ্যের আত্মার তত্ত্বাবধান করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। এই আদর্শবাদী গৃহত্যাগী বিপ্লবী ব্যারনের বংশধরের কাহিনী শুনিয়া গডউইন-পরিবারের সকলে মনে মনে তাঁহাকে এক মহাকাব্যের নায়করূপে কল্পনা করিয়া লইল।

www.pathagar.com

গডউইনের পত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া শেলি স্থির করিলেন, এই জীবন জগতের কল্যাণে সমর্পিত করিবেন। যেখানে মিথ্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চায়, সেইখানে শেলি পুরাকালের নাইটদের মতো অন্তরের ঐশী শক্তিতে বলীয়ান হইয়া একা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে; আত্মা যেখানে অপমানিত, অন্তর যেখানে শৃঙ্খলিত সেখানে শেলি বন্ধন-বিমোচন মূর্তিতে দেখা দিবে। এবং এই সংগ্রামে যদি জীবন আহুতি দিতে হয়, যদি এই কুৎসিত জগতের শতসহস্র কঠোর আঘাত সহিতে হয় তাহাও সে অম্লান বদনে সহ্য করিবে।

তখন আয়ারল্যান্ডের অন্তরে ইংলন্ডের পরাধীনতাপাশ হইতে ছিন্ন হইবার মৃদু বাসনা দোলা দিতে থাকে। শেলির দৃষ্টি প্রথমেই আয়ারল্যান্ডের উপর পড়িল। আয়ারল্যান্ডবাসীদের শোচনীয় নৈতিক অবনতি দেখিয়া শেলির কবি-হৃদয় এক মহৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। শেলি স্থির করিলেন, আয়ারল্যান্ডে গিয়া তিনি এই পঙ্গুতা ও জড়তার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য করিয়া আয়ারল্যান্ডের চিত্তকে জাগাইয়া তুলিবেন—মানবত্বের নূতন আদর্শ তাহাদের বিস্মৃত-স্মৃতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিবেন।

শেলির মন যে-মায়ালোকে ঘুরিয়া বেড়াইত সেখানে শেলি আয়ারল্যান্ডকে দেখিয়াছিল এক মহিমাময়ী নারীর রূপে। অপরূপ তাহার রূপ, অপরূপ তাহার রূপের লাঞ্ছনা। তাহাকে ঘিরিয়া কুৎসিত নিন্দুকের দল হাসিতেছে, বিদেশী সৈন্যরা তাহাকে ঘিরিয়া কুৎসিত ব্যঙ্গ করিতেছে। সেইখানে শেলি চলিয়াছে চিরসুন্দরের আহ্বানে, কুৎসিত অপমৃত্যুর হাত হইতে আয়ারল্যান্ডকে মুক্ত করিতে। হাতে তাহার অস্ত্র নাই, আছে গডউইনের *Political Justice.*

শেলি আপনাকে নায়ক ধরিয়া লইয়া মনে মনে বিপ্লবের একটি মানচিত্র আঁকিয়া লইয়াছিল। সৈন্যরা আসিয়া তাহাকে বাধা দিবে, হয়তো তাহাকে নির্মম আঘাত করিবে, সুন্দরের পূজায় শেলি রক্তপদ্মের মতো আপনার হৃদয় আহুতি দিবে—

শেলি আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা এলিজা ও হ্যারিয়েটকে জানাইল। এলিজা শেলির ব্যাপার শুনিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ কী পাগলামি—কিন্তু নিরুপায়—

অতএব একদিন এই তিনটি সমাজ-পরিত্যক্ত প্রাণী আয়ারল্যান্ডকে উদ্ধার করিবার মানসে ডাবলিন শহরের দিকে রওনা হইল।

শেলি ভাবিতেছিল—সুন্দরী আয়ারল্যান্ড! কুঞ্চিত কুন্তলে তার রবি-রশ্মি চূর্ণ—

এলিজা ভাবিতেছিল, শেলি যদি বাড়ি ফিরিয়া না গেল, তবে শেলিতে ও অন্য সাধারণ লোকে প্রভেদ কী?

ডাবলিন শহরে আসিয়া শেলি রাত্রিদিন আয়ারল্যান্ডের মুক্তির চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিল। সংস্কারের একটা পথও ঠিক করিয়া লইল—আয়ারল্যান্ড যদি মদ্য ছাড়িয়া দেয়, যদি মিথ্যা আচরণ না করে—তাহা হইলে আর ব্রিটিশ সৈন্যদের হাত হইতে রক্তারক্তির মধ্যদিয়া আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতাকে ছিনাইয়া আনিতে হইবে না। সেই মর্মে সে লেখা বিলি করিতে লাগিল। রাস্তায় লোক ধরিয়া ধরিয়া তাহার হাতে প্রচারপত্র দেয়। তাহারা প্রচারকের চেহারা দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়।

শেলি বক্তৃতা করে—লোকে হাসে। গডউইনের মহাভাবনা হইল—শেলি নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে—হয়তো মারামারি হইবে—ফলে যাবজ্জীবন কারাবাসও হইতে পারে—

কিন্তু ডাবলিনের পুলিশের কর্তা যখন শুনিলেন যে, ইংলন্ডের এক ব্যারনের পৌত্র আয়ারল্যান্ডের রাজধানীতে প্রচার করিতেছে যে, মদ খাইও না—তখন তিনি হাসিয়া আকুল

www.pathagar.com

হইলেন।

বিপ্লবীর উৎসাহ ক্রমশ নিভিয়া আসিতেছিল ; কোনো সৈন্য তাহাকে ব্যাঘাত দিতে আসিল না, কেহই জীবন মরণপণ করিল না—

সেন্ট প্যাট্রিকের স্মরণ-দিনে শেলি রাস্তায় বাহির হইয়া বিস্মিত হইয়া গেল। সমস্ত ডাবলিন শহর সেদিন মাতাল হইয়াছে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, সকলে। দরিদ্র—সেও মাতাল—টলিতে টলিতে চলিয়াছে। শেলির সম্মুখে আয়ারল্যান্ডের এক নূতন রূপ ফুটিয়া উঠিল—শেলি বিস্ময়ে দেখিল, সমগ্র আয়ারল্যান্ড যেন একটা বৃহৎ শুঁড়িখানা। কোথায় সূর্যরশ্মিকণা, কোথায় সুন্দরের লীলামূর্তি!

ধীরে ধীরে শেলির অন্তর্লোকের আয়ারল্যান্ডের স্থলে আর এক আয়ারল্যান্ড ফুটিয়া উঠিল—তাহার ভগ্ন গৃহে, জীর্ণ বাসে, দীর্ণ জীবনে, পাপে পঙ্কিলতায়, দেহের সর্বাঙ্গ দিয়া তাহার রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে—তবুও ফেনিল পাত্র লইয়া সে হাসিতেছে, নিরন্ন সে—তবুও সেই লাঞ্ছনার কথা শতমুখে সে-ই প্রচার করে—আর হাসে—

কোথায় সুন্দরী আয়ারল্যান্ড-এ কোন্ অসম্ভব দ্বীপ—অবান্তর জীবনের অমোঘ অবরোধ—

শেলির মন শ্রান্ত হইয়া পড়িল। শ্রান্ত-মনে ঘরের দিকে ফিরিয়া চাহিল—সেখানে কেহ নাই যে তাহার অন্তরের এই নিদারুণ পরাজয়ের কথা বোঝে। বিপুল বিশ্বের দিকে চাহিয়া দেখিল সে একা—নিঃস্ব— তাহাকে ঘিরিয়া অন্ধ আবর্তে চলিয়াছে তিমিরান্ধ মানুষের দখল—

কয়েকদিন পরে একদিন বোটে করিয়া তিনটি প্রাণী আবার ইংলন্ডের দিকে ফিরিয়া চলিল।

গডউইনের অনুরোধে শেলিরা লন্ডনে এক হোটেলে আসিয়া উঠিল এবং সেখান হইতে একদিন তাহারা গডউইন-পরিবারের আমন্ত্রণে তাহাদের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেলিকে দেখিবার জন্য গডউইন পরিবারের সমস্ত লোক বিশেষ উদগ্রীব হইয়াছিল।

কল্পনার আকাশ হইতে পুরাকালের গ্রিক-দেবতার মতো শেলি যেদিন গডউইনদের বাড়িতে পদার্পণ করিল, সেদিন সেই উন্মুখ-যৌবন কবির অপরূপ আবির্ভাবে সকলে সম্মোহিত হইয়া গেল। গডউইন একে একে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন—এই ফ্যানি, এই জেন, আর একটি মেয়েকে তুমি এখন এখানে দেখছ না—সে আমার প্রথম মেয়ে—মেরি, এখন সে স্কটল্যান্ডে, তার মা'র চেহারা দেখলে অবশ্য তার চেহারা আন্দাজ করতে পারবে।

শেলি লাইব্রেরি-ঘরে রাশীকৃত বই-এর উপরে দেখিল বিদুষী ও অপূর্ব সুন্দরী মেরি উলস্টোনক্রাফটের ছবি। সেইখানেই আরম্ভ হইল। এতদিন যে-সমস্ত কথা শেলির মস্তিষ্কে কোরক-রুদ্ধ ভ্রমরের মতো ঘুরিয়া ফিরিতেছিল—সহসা দুয়ার ভাঙিয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিল। যে-নারী এতকাল তাহার অন্তরের কুমেরু প্রান্তরে তুহিনে লুকাইয়া ছিল, আজ বুঝি তার ছায়া অন্তরেতে আলোর আভাসে ফুটিয়া উঠিল। মেয়েগুলি স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুধু চাহিয়া ছিল—চমক ভাঙিলে তাহার প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

শেলির সহিত গডউইন পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়িতে লাগিল এবং ঘনিষ্ঠতার মধ্যদিয়া শেলি বাহিরের নিদারুণ দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে যেন হারানো দিনগুলি ফিরিয়া পাইতে লাগিল। যে রূপ-দেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে একদিন তাহার জীবনের কল-নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইয়াছিল—আজ যেন আবার তরঙ্গের রঙ্গে সেই মন্দিরকে ঘিরিয়া তাহা নৃত্য করিতে লাগিল। শেলির মন সে ধারাস্রোতে বৃন্ত-খসা ফুলের মতো ভাসিয়া চলিল।

www.pathagar.com

এধারে কিন্তু রসদ একেবারে ফুরাইয়া আসিল। দারিদ্র্যের চরম অবস্থায় আসিয়া শেলি দেখিল যাহাদের লইয়া সে আজ যাযাবর, গৃহহারা—তাহারা আর যেন তাহার সহিত চলিতে পারিতেছে না। এলিজা তো স্পষ্টই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, আজকাল আর শেলির সহিত সে বেশি কথা বলে না। বাড়িতে মাঝে মাঝে ক্যাপটেন রিয়ান নামে কে একজন আসে; এলিজার বন্ধু নাকি। হ্যারিয়েটের দুঃখে তিনি বিশেষ দুঃখিত। এলিজার কাছে তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, এত অযত্নে হ্যারিয়েট থাকিতে পারে না।

এলিজা শেলির মতিগতি দেখিয়া বুঝিয়াছিল যে শেলি আর বাড়ি ফিরিতেছে না। এই দারিদ্র্য ও যাযাবর জীবনই তাহাদের ভাগ্যে আছে। এই সত্য উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে এলিজা নানাপ্রকার কলহে ও অযাচিত উপদেশে শেলির চিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। শেলির প্রত্যেক কার্যে সে প্রতিবাদ করে এবং ভগ্নীকেও এই বিদ্রোহে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

সেই সময় ইংলন্ডে উদারমতাবলম্বী সাহিত্যিকদের স্বমত প্রকাশ করার অপরাধে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইতে হইত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থদণ্ড হইত। খবরের কাগজে এই সমস্ত স্বাধীনচেতা সাহিত্যিকদের দুর্গতির সংবাদ পড়িয়া শেলির চিত্ত ব্যথিত হইয়া উঠিত এবং সে এই সমস্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত সাহিত্যিকদের সাহায্যের জন্য শতকরা ৪০০ হারে টাকা ধার করিয়া তাহাদের অর্থ পাঠাইতে লাগিল। এলিজা ও হ্যারিয়েট এই ব্যাপারে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

শেলির তখন একুশ বৎসর বয়স। এলিজা আশা করিয়াছিল যে, একুশ বছরে পড়িলে অর্থাৎ আইনের চোখে সাবালক হইলে শেলি নিশ্চয়ই পিতার সহিত একটা আপস করিবে। কিন্তু শেলি তেমন কিছুই করিল না। শেলির এই ব্যবহারে এলিজা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সামান্য একটা মতের জন্য লোকে এতবড় একটা আর্থিক স্বচ্ছন্দতা যে ত্যাগ করিতে পারে—সে-কথা এলিজা ভাবিতে পারিত না। শেলির এই একগুঁয়েমির দরুন তাহারা কতকাল আর কষ্ট সহ্য করিবে?

যে মন্ত্রের সাহায্যে সাধারণ নারী স্বামীকে বশে রাখে, স্বামীকে স্বতন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তোলে, এলিজা ধীরে ধীরে হ্যারিয়েটের কানে সেই সমস্ত মন্ত্র অহর্নিশি ঢালিয়া দিতে লাগিল। এলিজা একলা পাইলেই হ্যারিয়েটকে বোঝায়—তুই একেবারে বোকা! তুই একটু শক্ত হ! ওর তালে তাল দেবার কী দরকার তোর! দেখবি আমাদের বাড়ি, ঘর দোর, গাড়ি নিশ্চয়ই হবে।"

হ্যারিয়েটও ক্রমশ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিল এবং বাড়ি ও গাড়ি আদায়ের জন্য গার্হস্থ্য-সূত্রে যতপ্রকার নির্যাতন আছে তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিল।

শেলির চিত্ত আবার সংঘাত-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এ কোন্ পরিণতির দিকে সে চলিয়াছে—আত্মার সহচরী বলিয়া যাহাকে সকল বাধার ঊর্ধ্বে সে বরণ করিয়া লইয়াছে সে কি এই প্রতিদিনের জীবনের মতো এক বিরাট ভ্রান্তির প্রতীক?

শেলিদের সংসারে একটি নবাগত অতিথি আসিল—দুহিতারূপে। শেলি গ্রিক কাব্যসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার নাম রাখিল আয়ানথি। মা তাহাকে এলিজাবেথ বলিয়াই ডাকিল।

আয়ানথির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শেলির ক্লান্ত মন আবার যেন সজীব হইয়া উঠিল। সেই দুদিনের শিশুকে বেড়িয়া তাহার কল্পনা উধাও হইল। সে তো শুধু তাহার আত্মজা নয়—সে যে তাহার মানসকন্যা, তাহার ভাব-দুহিতা। এই শিশুর জীবনকে সুন্দরের মহাকাব্য করিয়া সে সৃষ্টি করিবে—

শিশুকন্যাকে কোলে লইয়া সযত্নে দোলা দিতে দিতে শেলি আপনার মনে ছন্দ-রচনা

www.pathagar.com

করে—প্রথম-তারার উদয়-ছন্দ, অস্ত-তারার বিদায়-ছন্দ, অনাগত-তারার আগমনী-ছন্দ—

হ্যারিয়েটেরও জীবনে পরিবর্তন আসিল। নারী জননী না হইলে আপনাকে জানিতে পারে না। কৌমার্য ও জননীত্বের মধ্যে নারীর আসল রূপ লুকানো থাকে। তাহার ত্রুটি অথবা মহিমা যৌবনের অঙ্গরাগে ধরা পড়ে না। তাই সন্তান আসে মাতাপিতার প্রেমের নিরিখ হইয়া।

শেলি বিস্ময়ে দেখিল যে হ্যারিয়েটের ল্যাটিন পড়া সহসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গান থামিয়া গিয়াছে। হ্যারিয়েটের মনকে এলিজা কাব্যকানন হইতে টানিয়া লইয়া কাপড়ের দোকানে, গয়নার দোকানে লইয়া চলিয়াছে। সেখানে শেলি যাইতে পারে না তবুও মাঝে মাঝে যাইতে হয়--হাতে হ্যান্ডনোট লইয়া। টাকায় টাকা সুদে কর্জ করিতে হয়—নতুবা বাপের ওখানে নতমস্তকে ফিরিয়া যাওয়া উচিত—কবিতায় দিন চলে না।

অসহায় শিশু যেমন নিশীথ অন্ধকারে জাগিয়া উঠিয়া জননীর স্পর্শের জন্য হাত বাড়াইয়া জননীকে না পাইয়া কাঁদিয়া ওঠে, শেলির মন তেমনি কাঁদিয়া উঠিত—তেমনি অসহায়ভাবে।

তবে কি মানসলোকের তীর্থযাত্রার দুস্তর পথে সহযাত্রী নাই?

টাকা ধার করিয়া শেলি দান করিত। যে-সমস্ত সাহিত্যিক তাহাদের আদর্শের জন্য নিরন্ন হইয়া ঘুরিয়া ফিরিত—তাহাদের বঞ্চিত করিয়া শেলি কেমন করিয়া অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার খোরাক জোগায়?

এলিজা শেলির জীবনকে নিত্য দুঃসহ করিয়া তুলিতেছিল। নানারকমের ছোটখাটো ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া মতান্তর হইতে নিত্য মনান্তর হইত।

রুশোর শিষ্য বলিলেন যে, হ্যারিয়েট শিশুকন্যাকে স্তন দিবে। এলিজা ঘোরতর প্রতিবাদ করিল। হ্যারিয়েট কিন্তু এলিজার কথাই শুনিল।

শেলিকে শুনাইয়া শুনাইয়া এলিজা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিত, 'গডউইনদের ধার শোধ দেবার বেলায় শেলির টাকার অভাব হয় না—যত রাজ্যের হতচ্ছাড়া সাহিত্যিকদের লুকিয়ে টাকা দেবার বেলায় ওর টাকার অভাব হয় না—কিন্তু নিজের বউ-এর জামা-জুতো দিতে হলেই ওঁর টাকার অভাব হয়! মেয়েমানুষ একটু সাজগোজ করবে না? আর এ বয়সে না করলে করবে কখন?'

রূপসজ্জাহীনা যে রূপসী ছায়া-বসনে মস্তিষ্কের মায়াকাননে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল—যাহার অপূর্ব আবির্ভাবের জন্য শেলি জীবনকে সহস্র ব্যথার ফুলে সাজাইয়া রাখিতেছিল—কোথায় সে নারী? ক্ষণে ক্ষণে ধরণীর প্রাঙ্গণে যে-ছায়ার ইঙ্গিত আভাসে ফুটিয়া উঠিয়া নিমেষে হারাইয়া যায়—কোথায় সে মূর্তির লীলাভবন?কোথা সে নারী? কোথা তার অভিসার পথ? তিমির নিবিড় কোন্ সে রজনী তার আবির্ভাব-লগ্ন? আকাশে কি তার বাসর? সমুদ্রে কি তার আহ্বান-শৃঙ্খল বাজে?

বাড়িতে মেজর রিয়ান নামধেয় এক ব্যক্তির যাতায়াত ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছিল; এলিজার সঙ্গে তাহার পরিচয়—সেই সূত্রেই হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাহার আলাপ।

লোকটি বহুদিন সৈনিক বিভাগে ছিল; তাই নারীজাতির প্রতি বীরজনসুলভ একটা বিশেষ শ্রদ্ধা তাহার ছিল এবং সেই কারণেই সুন্দরী হ্যারিয়েটের দুঃখ দেখিয়া তাহার মন সমবেদনায় ভরিয়া উঠিত। এই বীরপুরুষদের আদর্শবাদের মধ্যে এলিজা, হ্যারিয়েট যেন তাহাদের নিজের মনকে খুঁজিয়া পাইল।

www.pathagar.com

স্তম্ভিত বিস্ময়ে শেলি দেখিত হ্যারিয়েট আজকাল আর ভুলেও একখানা বইয়ের পাতা খোলে না; বাড়ির বাইরে দোকানে দোকানে সাধারণ মেয়েদের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার হাসির অর্থ বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার চলনের ভঙ্গি বদলাইয়া গিয়াছে—যে নারীকে শেলি আপনার অন্তরের আলোকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিল সে নারী তো এ নয়!

শেলির দিবস-নিশা ম্লান হইয়া আসিল। হ্যারিয়েটের সহিত যে তাহার সকল সৃষ্টির কল্পনা বিজড়িত—হ্যারিয়েট যে তার কাব্য, তার অশ্রুজলের মুক্তাফলের রচনা! সে যে তাহারই অন্তরের অন্তরবাসিনী। সে তো প্রেমিকা নয়, সেই তো প্রেম। তাহারই অন্তরের প্রেম কি তাহাকে আজ অবমাননা করিবে? যে প্রদীপ সে জ্বালাইয়াছে মন্দিরকে আলোকিত করিতে—সেই কি শেষে দহন করিবে মন্দিরকে?

সকল তারা নিভিয়া যাক—শুধু একটি তারা জ্বলিয়া থাকুক—প্রেমের শুকতারাটি! সকল জীবন ব্যর্থ হইয়া যাক—প্রেম যেন অমলিন রয়। বিগ্রহ ভাঙিয়া যায় যাক—স্বর্গের কল্পনা বাঁচিয়া থাক—

তাই শেলি শেষ চেষ্টা করিয়া দুহাজার পাউন্ড সই করিয়া পাঁচশো পাউন্ড ধার লইয়া নগরের এই মিথ্যাজীবন হইতে দূরে সুন্দরের লীলা-নিকেতন মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে আত্মগোপন করিবে—সেখানে নাম-না-জানা নদীটির কূলে পর্ণকুটিরে সুন্দর দেবতা নিত্য তাহার অমৃত প্রসাদ পাঠাইয়া দিবে—নদীটি বহিয়া যাইবে—সন্ধ্যায় বনান্তের শিরে শিশুচাঁদ উঠিবে—জোছনার মায়াপথ দিয়া বনলক্ষ্মীরা নামিয়া আসিবে—নিস্তব্ধ অরণ্যে, নিশীথ অন্ধকারে—শেলির অন্তরে—

হয়তো সেখানে প্রেমকে ফিরিয়া পাইবে....

কিন্তু এলিজা ও হ্যারিয়েট তাহা হইতে দিল না। নগরের নগ্নরূপ যাহাদের মনে বসিয়া গিয়াছে—অরণ্য তাহাদের কী সুখ দিবে? শেলি মর্মাহত হইয়া পড়িল যখন হ্যারিয়েট বারবার লন্ডনে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল।

শেলিকে লন্ডনে ফিরিয়া আসিতে হইল।

লন্ডনে আসিয়া তাহাদের সহিত হগের দেখা হইল। হগকে পাইয়া হ্যারিয়েট উল্লসিত হইয়া উঠিল। হগকে লইয়া সে এখন দোকানে বেড়াইতে যায়—ঘুরিয়া বেড়ায়—হগ পুরনোদিনের কথা ভুলে নাই। শেলিকে ডাকিয়া হগ সকল কথা বলিল। অনেক কথা—যা শেলি কল্পনায়ও ভাবে নাই...

হ্যারিয়েট এলিজার সহিত তাহাদের এক আত্মীয়ের বাড়ি চলিয়া গেল, শেলিকে একা রাখিয়া।

কিছুদিন পরেই শেলি খবর পাইল হ্যারিয়েট ও মেজর রিয়ান....

নারীর বিশ্বাসঘাতকতার সহিত বাস্তব জীবনে শেলি এমনই রূঢ়ভাবে প্রথম দেখা পাইল। কিন্তু শেলির অন্তর চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল : এ হতেই পারে না, তার প্রেমের অপমান সে সহিবে না, হ্যারিয়েটকে ফিরাইয়া আনিবে, যাহা চায় তাহাই দিবে।

কালবিলম্ব না করিয়াই শেলি হ্যারিয়েটের নিকট রওয়ানা হইল। শেলি ভাবিয়াছিল যে হয়তো তাহাকে দেখিয়া হ্যারিয়েট কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিবে ; শেলি স্তম্ভিত হইয়া গেল যখন হ্যারিয়েট তাহার সহিত ভালো করিয়া কথা বলিতেও চাহিল না।

শেলি কত অনুনয়-বিনয় করিল—হ্যারিয়েটের মন টলিল না।

www.pathagar.com

শেলির অন্তরের ভিতর যেন সহসা সমস্ত ভাঙিয়া গেল—অথচ সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। বিহ্বলের মতো রাস্তায় বাহির হইল—অগণ্য জনতার মধ্যে সে যেন একাকী—যেন একটি ক্লান্ত রবিরেখা তিমির গর্ভে।

শেলির অন্তর চাহিয়াছিল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অনন্ত ধারায় যে অনন্ত শক্তি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহার উৎস কোন্ মায়ালোকে অন্তর্লুপ্ত তাহার সন্ধান করা। প্রাচীন আর্য-ঋষিরা সকল সৃষ্টির উৎসরূপে পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ অস্তিত্বকে মানিতেন ; সন্দেহবাদী কবি সৌন্দর্যের ও প্রজ্ঞার লীলাভূমি নারীর প্রত্যক্ষ প্রেমের মধ্যে বিশ্বের সকল শক্তির উৎসকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন ! তাই প্রেমই ছিল শেলির প্রত্যক্ষ পরমেশ্বর; নারীর রহস্যময় অন্তর ছিল তাঁহার স্বর্গভূমি !

একদিন, বহুদিন আগে, আমাদের কোনো পূর্বপুরুষ অসীমকে জানিবার ব্যাকুল ও বিপুল বাসনা লইয়া রূপে রূপে তন্নতন্ন করিয়া পরম অজ্ঞাতকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিলেন। পাহাড়ে, প্রান্তরে, নির্ঝরে, নদীতে, প্রস্তরে, বৃক্ষে, আকাশে তন্নতন্ন করিয়া—সেদিন অন্তরে ব্যাকুল প্রশ্ন লইয়া আদি কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে হিরণ্ময় পুরুষ, কোথা তুমি ?—এই বৃক্ষে, এই কল-নির্ঝরে, এই সূর্যকিরণে, এই শিলায় ? কোথায় তুমি, কোথায় তোমার আবির্ভাব ?

প্রেমপিয়াসী কবিও সেদিন তেমনি ব্যাকুলভাবে উর্ধ্ব আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিয়াছিল—হে পরম সুন্দর, কোথায় তোমার আবির্ভাব ?

কবির অন্তর ভাব ও ভাবনার পরিপূর্ণ আবির্ভাব ব্যতিরেকে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বাতাস যেমন নিত্য প্রবহমান, জল যেমন নিত্য আধার-আশ্রয়ী, কবির চিত্ত তেমনি নিত্য আবির্ভাব-প্রয়াসী। ক্ষণে ক্ষণে তাহার মন-বীণায় সুদূর অভিসারিকার নূপুরধ্বনির ছন্দ বাজিয়া ওঠে—ক্ষণে ক্ষণে ধরণীর আলোছায়ার খেলায় চকিতে যেন কার মায়াঞ্চল দুলিয়া ওঠে—

শেলি আবার নিত্য সন্ধ্যায় গডউইনদের বাড়ি যাতায়াত করিতে লাগিল। ফ্যানি ও জেনের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেলির অন্তরে সন্দেহ জাগে, হয়তো এরাও মিথ্যাময়ী। নয়নে এদের কই সে অমৃতবাণী লেখা—যে বাণীর আহ্বান একেবারে অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়।

ফ্যানি ও জেন দুইবোনে কিন্তু আপনাদের অজ্ঞাতসারে শেলির অন্তরের দেবতার আবির্ভাব-ক্ষণটিকে নিবিড় করিয়া আনিতেছিল। মেরির রূপ ও গুণের নিত্যনূতন বর্ণনায় তাহারা শেলির মনকে ভরাইয়া দিত—তরুণী দুইটির দিকে চাহিয়া শেলির মন তাহাদের ছাড়াইয়া তখন বহুদূরে চলিয়া যাইত—নির্জনতায় পরম-সুন্দর অরণ্য, পদনিম্নে কল-নির্ঝরিণী গাহিয়া চলিয়াছে—সূর্যকিরণের মতো স্বচ্ছ, চন্দ্রালোকের মতো রহস্যময়ী নারী দাঁড়াইয়া—তাহাকে ঘিরিয়া হোমার প্লুটার্কের বীণা-ছন্দে বাণী-অভিনন্দন জাগিতেছে—

সে কি মেরি ?

ওধারে ফ্যানি ও জেন স্কটল্যান্ডে মেরির নিকট পত্র লিখিত ; তাহাদের বাড়িতে তাহাদের সুখ-দুঃখে, আদর্শে ও কর্মে পরম বন্ধু হইয়া এক উদাসী পথিক আসিয়াছে—সমাজকে ভয় করে না—অর্থকে সে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, সত্যের একান্ত সাধক—কঠোর নয়, সুন্দর দেবতা, বুঝি বা সুন্দরতম। গ্রিক-ছন্দের অন্তরালে মেরির বিষণ্ন উদাস-মনে শঙ্খনাদে যেন আপোলো নামিয়া আসিত—পরম দেবতা, চরম সুন্দর।

ছুটির সময় মেরি বাড়ি আসিল। শেলির অন্তর বেতসলতার মতো কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, এই তো আবির্ভাব। শেলির চোখের দিকে চাহিয়া মেরির বিষণ্ন প্রতিভা ফুলের মতো ফুটিয়া

www.pathagar.com

উঠিল—হে সূর্য, অন্তর-শতদলের হে অমৃত বন্ধু—

অন্তর যাহাকে চায়—তাহাকে নিমেষেই চেনা যায়! নিমেষেই তাহারা চিরকালের বর-বধূর মতো নিজেদের বুঝিয়া লয়। একটি নিমেষের পাত্রে অনন্ত যুগের সঞ্চিত ধন ভরিয়া ওঠে।

মেরি স্বর্গগতা মাতার স্মৃতিকে শ্রদ্ধা করিত; বাড়িতে বিমাতা—পিতা বিমাতার মুখাপেক্ষী। তাই বাড়ি আসিলেই মেরি সন্ধ্যায় একাকী মাতার কবরে গিয়া বসিত, মাথার উপরে একে একে সন্ধ্যাতারার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিত, মেরি আপন মনে আপনার সহিত কথা বলিত....

শেলি একদিন রাগ-কম্পিত দেহে আবেদন জানাইল, সন্ধ্যায় তাহার মাতার কবরে সেও সঙ্গে যাইবে।

আবেদন গ্রাহ্য হইল। আবার সেই শেলি, প্রেম-বেপথু—পাশে নারী রহস্যময়ী, মাথার উপরে সেই সন্ধ্যা-তারকা। কবরে তাহারা নিত্য প্রদীপ জ্বালাইয়া চলিয়া আসিত। কখনো মধ্যরাত্রে তারার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মাটির প্রদীপের আলো নিভিয়া যাইত।.....

শেলি সমস্ত কথা মেরিকে বলিল। না-বলা ছাড়া আর উপায় নাই। শেলির সমস্ত মন, সমস্ত মস্তিষ্ক, সমস্ত রক্তবিন্দুতে মেরির নয়নের আলো আসিয়া পড়িয়াছে—জোয়ারে যেমন সাগরে পূর্ণচন্দ্রের রশ্মি আসিয়া পড়ে। যে বাধাহীন আদি নিয়মে নদী সমুদ্রমুখে ছুটিয়া চলে, সেই আদি নিয়মে শেলির মন মেরির দিকে চলিয়াছে। সে নিয়মের কাছে শেলি অসহায়।

কিন্তু শেলির সহিত হ্যারিয়েটের বিবাহবন্ধন আইনত ছিন্ন হয় নাই। শেলি এখনও যে বিবাহিত। হ্যারিয়েট সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিবার জন্য হ্যারিয়েটকে ডাকাইয়া আনিল। হ্যারিয়েট আসিল। হ্যারিয়েটের দিকে চাহিতে শেলির মনে একসঙ্গে ঘৃণা ও বিষাদ জাগিয়া উঠিল। হ্যারিয়েট তখন গর্ভবতী। মেরির আবির্ভাবে হ্যারিয়েটের অন্তর একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্মৃতিগন্ধভারাতুর কবির মন হ্যারিয়েটের দিকে চাহিয়া বিহ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু অন্তরের বন্ধন যেখানে ছিন্ন সেখানে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বাড়াইয়া কী লাভ? অন্যায় সঙ্কোচ ও ঘৃণাকে দেহের অভ্যন্তরে পুষিয়া রাখিয়া প্রেম থাকিতে পারে না। আর যেখানে প্রেম নাই সেখানে মিলনের সামাজিক প্রহসনের কোনো ব্যক্তিগত মূল্য নাই। তাই শেলি আপনার অন্তরের নিকট আপনি সত্য থাকিবার জন্য হ্যারিয়েটকে সকল কথাই বলিল এবং হ্যারিয়েট যদি তাহাদের সঙ্গে না-থাকে তাহা হইলে নিয়মিত অর্থসাহায্য করিবার ওয়াদা করিল। মেরির সঙ্গে থাকিতে হ্যারিয়েট ঘোরতর আপত্তি করায় উভয়ে মিলনের সকল সম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিল।

গডউইন সমস্তই বুঝিতেছিলেন; সমাজ-বিদ্রোহী লেখক আর সমাজ-বিদ্রোহী পিতা এক জিনিস নয়।

গডউইনের টাকার দরকার। শেলি ব্যারনের বংশধর; রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—আবার ফিরিয়া যাইবে—ইহাই গডউইন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। এলিজার মতো গডউইনও দেখিলেন যে সেদিকে শেলির কোনো চেষ্টা নাই।

শেলিদের উকিল চিঠি লিখিয়া জানাইল যে, তাহাদের সম্পত্তি উইল করা হইতেছে—শেলি ফিরিয়া না আসিলে তাহাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে। গডউইন ক্রুদ্ধ হইয়া দেখিলেন যে, শেলি সে চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

শেলির সহিত মেরির সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিল, গডউইন ততই শেলির উপর বিরক্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন গডউইন সত্য সত্যই শেলিকে তাঁহার

www.pathagar.com

বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে একদিন ভোর চারটার সময় গডউইনদের বাড়ির সামনে একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল; একটি মেয়ে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া গাড়িতে আসিয়া উঠিল। তাহার সঙ্গে জিনিসপত্র লইয়া আর একটি মেয়েও আসিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

আকাশে তখন তারারা নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল, পথের গ্যাসল্যাম্পগুলিও নির্বাপিত-প্রায়। শেলি, মেরি ও জেন বাধাহীন অনির্দেশের পথে যাত্রা করিল।

১৮১৪ সালে প্যারি নগরীর পথে তিনটি অদ্ভুত প্রাণী একটি হোটেল ঠিক করিয়া লইয়া কিছুদিনের জন্য সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অন্তরের বাসনা তাহারা সুইজারল্যান্ডে যাইবে।

কিন্তু পথ ফুরাইয়া গেল। সঙ্গের টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। অগত্যা সঙ্গে সোনার যে-সমস্ত জিনিস ছিল তাহাই বন্ধক রাখিয়া প্যারি নগরীতে কিছু টাকা কর্জ করিয়া ঠিক করা হইল যে পদব্রজেই সুইজারল্যান্ডে যাইতে হইবে। জিনিসপত্র বহিবার জন্য শেলি একটি গর্দভ কিনিল। তিনটি প্রাণীর জায়গায় চারিটি হইল।

সেই সময় ফ্রান্সের পথঘাট মোটেই নিরাপদ ছিল না। সবেমাত্র তখন সৈন্যদল ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে; পথেঘাটে তখন নিত্যই ডাকাতি হইত; ভয়ে নির্জন পথে কেহ চলিত না। তাই গ্রামবাসীরা ভয়ে ও বিস্ময়ে সেই অপূর্ব যাত্রীদের দিকে চাহিয়া থাকিত। এই নির্জন ভয়সঙ্কুল পথে দুইটি অসামান্য রূপসী তরুণীকে সঙ্গে লইয়া একটি যুবক চলিয়াছে—সঙ্গে একটি গর্দভ।

কিছুদূর যাইতে-না-যাইতেই দেখা গেল যে, যাহাকে সহায় করিয়া এই সুদূর পথে যাত্রা শুরু করা হইয়াছিল, সে-ই সকলের আগে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। যে-গ্রামে আসিয়া প্রথম রাত্রিবাস করিতে হইল সেখানেই তাহাকে একটি চাষার নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলা হইল। বিনিময়ে একটি অশ্বতর কেনা হইল।

রাত্রে চাষাদের বাড়িতে আশ্রয় লইতে হয়। সারারাত জাগিয়া কাটে। নবীন দম্পতি রাত্রি জাগিয়া দেখে অন্ধকারে বৃহদাকার ইঁদুরেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে—চামচিকির ডানার ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে আসিয়া লাগে। সমস্ত গ্রাম শুকাইয়া গিয়াছে। মাঠে শস্য নাই, গৃহস্থের ঘরে অন্ন নাই, গোয়ালে গরু নাই যে দুধ মিলিবে। বিগত যুদ্ধ সমস্ত গ্রামকে রিক্ত ও শুষ্ক করিয়া দিয়াছে। তবুও ইহারই মধ্যদিয়া এমনিভাবে যাইতে হইবে—সংস্কার ও মিথ্যা মোহের দেশ হইতে দূরে অনন্ত তুষারের নির্জনতায়—প্রেমের নিত্যধামে।

ক্রমে সমতলভূমি শেষ হইয়া পর্বত দেখা দিল। ক্রনানের পথ দিয়া যাইতে যাইতে স্বাধীনতার অগ্নিহোত্রী উইলিয়াম টেলের পরিত্যক্ত গৃহ শেলির চোখে পড়িল। কেহ আজ আর সেখানে থাকে না। বিরাট দুর্গটি চারিদিকে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। শেলির মন বলিল, এইখানেই থাকিতে হইবে, এই ভগ্ন দেউল স্বাধীনতার তীর্থ—এই তীর্থে তিনি তাঁহার চির-আবাসভূমি রচনা করিবেন।

সেখানেই দুইটি ঘর ভাড়া করিয়া নূতন করিয়া গৃহস্থালি গড়িয়া তোলার আয়োজন চলিতে লাগিল। গ্রামের কর্তা আসিয়া ঘরের চাবি খুলিয়া দিল। জিনিসপত্র কিনিয়া দিয়া সাহায্য করিল। রাত্রিটি কোনোরকমে কাটিয়া গেল।

সকালবেলা রাঁধিবার আয়োজন করিবার সময় দেখা গেল যে স্টোভ কিছুতেই জ্বলে না। শেলি নানারকমের চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই স্টোভটি জ্বালাইতে পারিল না। বিরক্ত হইয়া শেলি

www.pathagar.com

বলিয়া উঠিল—চল, ইংলন্ডেই ফিরিয়া যাওয়া যাক। আর দুইটি প্রাণী তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল, নিশ্চয়ই আজই।

সকলের কাছে টাকাকড়ি মিলাইয়া দেখা গেল যে কোনোরকমে জাহাজে করিয়া ফিরিয়া যাইবার অর্থ আছে। সেইদিনই তিনটি প্রাণী সমুদ্রপথ দিয়া ইংলন্ডের দিকে রওনা হইল। পরের দিন কুশল-সংবাদ লইতে আসিয়া বৃদ্ধ গ্রামের কর্তা বিস্মিত হইয়া দেখেন ঘর শূন্য। পথিকরা চলিয়া গিয়াছে।

নানা পথ ঘুরিয়া রোটারডামে আসিয়া যাত্রীরা দেখিল সঙ্গে তাহাদের পাথেয়স্বরূপ একটি কপর্দকও নাই। রোটারডাম হইতে ইংলন্ডে যাইবার ভাড়া নাই। শেলি ইংলন্ডগামী জাহাজের ক্যাপ্টেনের সহিত দেখা করিয়া সমস্ত বলিল। ক্যাপটেন তাহাদের ইংলন্ড পৌঁছাইয়া দিতে রাজি হইল।

লন্ডনে আসিয়া শেলি একটি গাড়ি ভাড়া করিল। কিন্তু সঙ্গে গাড়ির ভাড়া নাই। তাই প্রথমেই ঠিক করিল যে একবারে ব্যাংকে গিয়া উঠিবে ; সেখানে সামান্য কিছু টাকা শেলির নামে পড়িয়া ছিল। ব্যাংকে আসিয়া শেলি শুনিল যে তাঁহার নামে একটিও টাকা নাই। তাহার সই দিয়া হ্যারিয়েট তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

শেলির নিকট হ্যারিয়েটের ঠিকানা ছিল। কালবিলম্ব না করিয়া শেলি তৎক্ষণাৎ মেরি ও জেনকে লইয়া হ্যারিয়েটের দরজায় উপস্থিত হইল। মেরি গাড়ি হইতে নামিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। উপর হইতে হ্যারিয়েট শুধু শেলিকে দেখিয়া আনন্দে প্রত্যাগত স্বামীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সিঁড়ি দিয়া ছুটিয়া আসিতেই মেরির স্বর্ণাভকেশগুচ্ছ চোখে পড়িল। রাগে, ক্ষোভে হ্যারিয়েট কাঁপিতে লাগিল। শেলিকে অভিবাদনও করিল না। টাকা উঠানোর কথায় হ্যারিয়েট তাহার প্রাপ্য টাকাই লইয়াছে বলিল। নানা অনুনয়-বিনয়ের পর শেলি হ্যারিয়েটের নিকট কয়েক পাউন্ড ধার লইয়া লন্ডনের এক জঘন্য পল্লিতে একটি সামান্য ঘর ভাড়া করিয়া বসিল।

গডউইন চিঠি লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদের মুখদর্শন করিতে রাজি নন। একদিন যে শেলির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, তাহার জন্য তিনি লজ্জিত। শেলি লিখিল, 'আমি তো শুধু আপনার বাণীকেই রূপ দিয়াছি। আমার জীবন যে আপনার *Political Justice*-এর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।'

এই উত্তরে গডউইন আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গডউইন কোনোদিন ভাবেন নাই যে, তাঁহার কথার জীবন-প্রয়োগ এমনি করিয়া তাঁহার বাড়িতেই হইবে। গডউইন ভুলিয়া গেলেন যে, একটি অসহায় যুবক দিনের পর দিন তাঁহাকে অর্থ জোগাইয়াছে—তাঁহার আদর্শকে রূপ দিতে নিজেকে কতখানি রিক্ত করিয়াছে। শেলি ও মেরি মুখোমুখি বসিয়া তাই ভাবে। কখনো নিঃশব্দে কবির মুখ হইতে গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হয়—*Oh! Philosophy!*

ইংলন্ডের রাজধানীর এক জঘন্য পল্লিতে অর্ধাহারে সমাজ পরিত্যক্ত একটি পরিবার বাস করিত। জগতে তাঁহাদের কোনো আত্মীয় ছিল না—এমনকি একদিন যাহাদের জন্য তাহারা ঋণ করিয়াছে, আজ তাহারাই পাওনাদারদের লুকাইয়া খবর দেয়, নালিশ করিতে বলে। তবুও সেদিন তাহাদেরই মধ্যে একজনের জন্য ইংলন্ডের মাথার উপরে সূর্য সোনার কিরণের অর্ঘ্য বহিয়া আনিত—তাহারই জন্য আকাশের সীমাহীন নীলের পারাবারে আলোর কমল—মুকুলদল ফুটিয়া উঠিত, শুধু সে স্মরণে রাখিবে বলিয়া ইংলন্ডের বন-কুসুম রঙে-রূপে-রসে ভরিয়া উঠিত।

www.pathagar.com

শেলি ও মেরির মিলিত জীবনের শতদলের পাশে, পাতার আড়ালে একটি ম্লান কুমুদ ফুটিয়া উঠিতেছিল। এতদিন তাকে চোখে পড়ে নাই। আজ নিঃসঙ্গতার নিশীথে সে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেও বুঝি শতদলের সহচরী। মুখর জীবনের সূর্যকরে সে আপনার মনে মুকুলজীবন যাপন করিয়া আজ নিশীথের চন্দ্রালোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জেন এতদিন ধরিয়া ছায়ার মতো শেলি ও মেরির দাম্পত্য-জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। শেলির প্রতি তাহার কিশোরীজীবনের যে শ্রদ্ধা ছিল আজ যৌবনের তটভূমে আসিয়া তাহা প্রেম হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠিক আগেকার মতোই জেন শেলির প্রশংসা করে—কিন্তু তাহার সুর আজ মেরির কাছে যেন ভিন্ন লাগে। মেরি যেন স্পষ্টই দেখিতে পায় সে শ্রদ্ধার অন্তরালে যৌবনের পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন লুকাইয়া রহিয়াছে। মেরি শেলিকে সমস্ত খুলিয়া বলে; কিন্তু শেলি কেমন করিয়া বোঝে যে ইহা অন্যায়?

মেরি সন্তানসম্ভবা হইয়া আসিতেছিল। তাই ইদানীং আর বাহির হইত না। জেন-ই শেলির সঙ্গে কাজেকর্মে বাহিরে যাইত। শেলি গল্প করিত—তাহার অতীত জীবনের কথা—তাহার ভাব ও ভাবনার কথা। জেন মুগ্ধ হইয়া শুনিত। অন্তরের নিরুদ্ধ প্রেম দেহকে শুধু রোমাঞ্চিত করিয়া অন্তরেই ফিরিয়া যাইত।

মেরি কিন্তু একদিন ভগ্নীকে রীতিমতোভাবে তিরস্কার করিল। তিরস্কৃত হইয়া জেন সারাদিন একা-একা বিষণ্ন মুখে রহিল। কাহারও সহিত কথা বলিল না—আহারও করিল না। রাত্রে শেলি জেনকে আলাদা ডাকিয়া তাহাদের সম্বন্ধের জটিলতার কথা বুঝাইল। কবির কণ্ঠস্বরে করুণ-কোমলতা—নারীর নয়নে অশ্রুবিন্দু।

জেনকে শান্ত করিয়া শেলি মেরিকে সমস্ত ব্যাপার বলিল। কিছুক্ষণ যাইতে-না-যাইতেই শেলি ও মেরি উভয়ে বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, জেন পাগলের মতো ছুটিয়া আসিতেছে।

'কী ব্যাপার! মুখ যে শুকিয়ে গেছে—কী হয়েছে?'

'একলা থাকতে আমার ভয় করছে! বাড়িতে ভূত আছে! আমার ঘরের চারপাশে কারা ঘুরে বেড়াচ্ছে—চল এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই।'

অনেক রকমে জেনকে শান্ত করিয়া ঘরে পাঠানো হইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই একটা আর্তনাদ শোনা গেল। শেলি ও মেরি ছুটিয়া গিয়া দেখে উদ্‌ভ্রান্তের মতো জেন শূন্যে চাহিয়া আছে।

'ভূত! ভূত আমার মাথার বালিশ ধরে টানছিল।' সে-রাত্রি মেরি ভগ্নীর পাশেই রহিল কিন্তু মনে মনে ভূতের চেয়ে ভগ্নীর উপরই বেশি ক্রুদ্ধ হইল।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একটা লোক আসিয়া একখানি চিঠি শেলির হাতে দিয়া বলিল যে, একটি মেয়ে রাস্তায় তাহাকে এই চিঠিখানি শেলিকে দিতে বলিয়াছে। মেরির ভগ্নী ফ্যানি চিঠি লিখিয়া জানাইয়াছে যে, শেলিকে শীঘ্র জেলে দিবার বন্দোবস্ত হইতেছে অতএব শেলি যেন সাবধান হয়। এই চিঠি তাহাকে খুব লুকাইয়া লিখিতে হইয়াছে, কেননা গডউইন জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না। ফ্যানির সহিত দেখা করিবার জন্য শেলি তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল—পিতৃভয়ভীতা বালিকা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইতেছে।

ছুটিয়া গিয়া শেলি ফ্যানিকে ধরিল। ফ্যানি কাঁপিতে কাঁপিতে যাহা জানিয়াছিল সমস্তই বলিল। পাওনাদাররা শীঘ্রই তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবে।

www.pathagar.com

শেলির জীবনের চারিদিক অন্ধকারে ভরিয়া আসিল। সেই নিবিড় অন্ধকারে শুধু মেরির প্রেম একমাত্র আলোর শিখা হইয়া জ্বলিতেছিল।

টাকা শোধ দিবার কোনো উপায় নাই—একমাত্র উপায় আত্মগোপন। অগত্যা তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। শেলি একা ভিন্নস্থানে লুকাইয়া বাস করিতে লাগিল—মেরি ও জেন পুরনো বাসায় রহিল।

শুধু রাত্রির অন্ধকারে এক নির্জন সরাইখানায় দুইজনে দেখা হয়। মেরি ভয়ে যায়—যদি পুলিশের লোক তাহার পিছু লইয়া সন্ধান পায়।

একদিন এই ভয় এত পাইয়া বসিল যে, তাহারা তাড়াতাড়ি সামনের এক সরাইখানায় ঢুকিয়া পড়িল। যে-সমস্ত চাষিরা গ্রাম হইতে শহরে আসে তাহারা এইখানে রাতে কাটায়। শেলি রাত্রিতে থাকিবার কথা বলিতে হোটেলের কর্তা জানাইয়া দিলেন যে, এখানকার খাবার না খাইলে থাকিতে দেওয়া হয় না। শেলি পকেটে হাত দিয়া দেখিল যে খাবার মতো পয়সা নাই। হোটেলের একটি লোক মারফত কিছু পয়সা চাহিয়া বন্ধু পিককের নিকট একখানি চিঠি লিখিল। শেলির পকেটে সর্বদাই একখানি শেক্সপিয়ার থাকিত। সরাইখানার ম্লান-আলোকে সেইখানি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর লোকটি ফিরিয়া আসিল। পিকক লিখিয়াছেন—'বন্ধু একটিও পয়সা ত্রিভুবনে নাই, আমার সংগৃহীত আহারের অর্ধাংশ পাঠাইলাম।'

১৮১৫ সালে সহসা এই নিদারুণ অর্থসমস্যার একটি মীমাংসা হইয়া গেল। শেলির বৃদ্ধ পিতামহ তিরাশি বৎসর বয়সে উক্ত বৎসরের জানুয়ারি মাসে পরলোকগমন করিলেন এবং তিনি তাঁহার দুলক্ষ পাউন্ডের বিরাট সম্পত্তি উইল করিয়া পুত্রের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

শেলি জেনকে সঙ্গে লইয়া পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু পিতা তাঁহাকে বাড়িতে প্রবেশ করিতে দিলেন না। দরজার নিকটে বাহিরের ঘরে শেলিকে বসিয়া থাকিতে হইল। তাঁহার এক নিকট-আত্মীয় আসিয়া গোপনে শেলিকে উইলের সমস্ত ব্যাপার জানাইল। উইলের বন্দোবস্ত অনুযায়ী শেলি তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর ৮০ হাজার পাউন্ডের এক সম্পত্তি পাইবে—আইনত সে-সম্পত্তি হইতে শেলিকে বঞ্চিত করা যায় না এবং তাহার এক আত্মীয়ের দেওয়া ১৮ হাজার পাউন্ডের আর এক সম্পত্তির আয় শেলি এখন ভোগ করিতে পারে।

শেলির পিতা পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। এক উকিলের মধ্যস্থতায় ঠিক হইল, শেলি আত্মীয়ের দেওয়া সম্পত্তি পিতার নিকট বিক্রয় করিবে। উক্ত সম্পত্তির বিনিময়ে শেলির বাৎসরিক এক হাজার পাউন্ড আয়ের বন্দোবস্ত হইল এবং পুত্রের ঋণ শোধের জন্য টিমথি শেলি একসঙ্গে আরও তিন হাজার পাউন্ড দিলেন।

বিরাট সম্পত্তি ভোগ করিবার কোনো লালসা শেলির ছিল না—আর্থিক দুর্গতির হাত হইতে মুক্তি ক্রয় করিবার মতো অর্থই শেলি যথেষ্ট বিবেচনা করিত। তাই এই ব্যবস্থায় সে সন্তুষ্ট হইল। ঋণ পরিশোধ করিয়া দিয়াই শেলির প্রথম চিন্তা হইল হ্যারিয়েটকে লইয়া। বাৎসরিক দুশো পাউন্ড দিবার অঙ্গীকার করিয়া শেলি হ্যারিয়েটকে এক পত্র লিখিল। কিন্তু বিপদ হইল জেনকে লইয়া।

শেলি জানিত যে, যে-কোনো মেয়ের সঙ্গে সারারাত পাশাপাশি বসিয়া হোরেস বা পেট্রার্ক পড়ার মধ্যে আনন্দ আছে অপরিমিত এবং ভাবিত যে তাহাকে হৃদয় সমর্পণ না করিয়াও নির্বিঘ্নে সাহিত্যালোচনা করা অসম্ভব নয়।

www.pathagar.com

মেরিও জানিত যে শেলি কখনো লোভের দ্বারা প্রেমকে কুণ্ঠিত করিবে না, করিতে পারে না বলিয়াই। সারাদিন ধরিয়া মেরি মনকে তাহাই বুঝাইত কিন্তু দিনশেষে দেখা যাইত যে, মনকে সে বুঝাইতে যতখানি চেষ্টা করিয়াছে ঠিক ততখানি মনে মনে সে অবুঝ হইয়া উঠিয়াছে।

উপায়ান্তর না দেখিয়া মেরি একদিন রাত্রিতে শেলিকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। জেনের এই বাড়িতে থাকা আর সম্ভব নয়। মেরি শেলির হাতেপায়ে ধরিয়া সানুনয়ে জানাইল যে যেমন করিয়াই হউক, জেনকে অন্যত্র কোথাও পাঠানোর বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। শেলি মেরির মনোভাব বুঝিয়া ক্ষুব্ধ হইল, তৎসত্ত্বেও জেনকে অন্য কোথাও কোনো স্কুলে শিক্ষয়িত্রী করিয়া পাঠানো যায় কিনা তাহার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদের সুনাম এতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে জেনের পরিচয় পাইয়া কোনো স্কুল তাহাকে শিক্ষয়িত্রী করিয়া লইতে রাজি হইল না। জেনের অবশ্য চলিয়া যাইবার কোনো ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে ঠিক হইল যে লিনমাউথে গডউইন-পরিবারে একজন বিধবা বাস করেন—তাঁরই কাছে জেন থাকিবে।

তাহার দুই-তিনদিন পরেই জেন লিনমাউথে চলিয়া গেল। মেরি পুরনো ডায়েরি পরিত্যাগ করিয়া সেদিন আর-একখানি নূতন ডায়েরি তৈয়ারি করিল এবং তাহার প্রথম পাতায় লিখিল : আমাদের নবজন্ম লাভের সঙ্গে নূতন করিয়া দিনের কাহিনী লিখিতে শুরু করিলাম।

গ্রামের একান্ত নির্জনতার মধ্যে এইরকমভাবে নির্বাসিত হইয়া জেন একেবারে আপনার অন্তরের মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত অপমানিত আত্মনিবেদন আজ আত্মসমর্পণের উদগ্র বাসনায় দাবাগ্নির মতো জ্বলিয়া উঠিল। এতদিন তিলে তিলে প্রেমের যজ্ঞশালা হইতে সে নীরবে যে-অগ্নিকণা সংগ্রহ করিতেছিল, আজ নিশীথের অতর্কিত-লগ্নে সে দাবানল হইয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—দগ্ধ হইবার এবং দমন করিবার এক বিপুল তাড়না তাহার সমস্ত অন্তরকে মথিত করিয়া ফেলিতেছে।

শেলিকে সে-যে পাইবে না তাহা সে ভালোরকমই বুঝিয়াছিল কিন্তু শেলির নামের সহিত জেনের মনে একটি কবির অপূর্ব রূপসম্মোহন জড়াইয়া গিয়াছিল।

তখন ইংলন্ডে দিগন্তরেখা রক্ত-আলোয় সমুদ্ভাসিত করিয়া আর এক প্রতিভার দীপ্ত-সূর্য জাগিয়া উঠিতেছিল। ইংলন্ড তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। ইংলন্ডের সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিত, কিন্তু সকলেই তাহার কবিতা কণ্ঠস্থ করিত। তাহার গোপন কীর্তি-কাহিনীর কথা ইংলন্ডের প্রত্যেক নারী সালঙ্কারে জানিত। তাহার নামের চারিদিকে ইংলন্ডের নরনারী অপূর্ব রূপ দিয়া অসম্ভব কুৎসার মাল্য-রচনা করিতেছিল। কোনো সংস্কারকে সে মানে না, কোনো ব্যভিচারে সে কুণ্ঠিত হয় না, তাহার রূপ ও তেজের দৃপ্ত-চক্র সগর্বে ইংলন্ডের বুকের উপর দিয়া চলিয়াছিল।

প্রত্যেক নারী প্রকাশ্য সভায় তাহাকে ঘৃণা করিত—গোপনে কিন্তু তাহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িত। অকসফোর্ডের কাউন্টেস্ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলন্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারা তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে; প্রত্যেক আত্মসমর্পণকে সে নির্মমভাবে অপমান করিয়াছে; তবুও তার জীবনের কাহিনীর প্রত্যেক পাতা আত্মসমর্পণের আকুতিতে ভরা।

যেদিন সে বিবাহ করে, গির্জা হইতে গাড়িতে উঠিয়াই নবপরিণীতা স্ত্রীকে সে বলে—'আজ থেকে তুমি যখন আমার স্ত্রী হলে, তখন আমার ঘৃণা ব্যতীত আর বেশিকিছু আমার কাছে তুমি আশা কোরো না। যদি তুমি পরস্ত্রী হতে, তবে হয়তো আমার ওপর তোমার দাবি থাকতে

www.pathagar.com

পারত।' এক বৎসরের মধ্যেই এই বিবাহ ভাঙিয়া যায়। এমনিভাবেই ইংলন্ড বায়রনকে জানিত; বায়রনও ইংলন্ডকে এমনিভাবেই দেখিতেন।

জেন চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বায়রনের ঠিকানা সংগ্রহ করিল এবং বায়রনকে পত্র লিখিল :

'একজন অপরিচিতা আজ আপনাকে সম্বোধন করিতেছে ; তার অপরাধ মার্জনা করিবেন। আমি কোনো দয়াদাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী হইয়া আপনার দ্বারে উপস্থিত হই নাই...আমার পত্রের ভবিষ্যৎ-ভাগ্যচিন্তায় আমি কাঁপিয়া উঠিতেছি। যদি আপনি ঘৃণায় আমাকে জঘন্য নির্লজ্জা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন, আমি আপনাকে দোষ দিব না। কিন্তু এ-কথা শুনিতে বড়ই আশ্চর্য লাগিবে—কিন্তু ইহা একান্ত সত্য যে, আমার জীবনের সকল সুখদুঃখ আজ শুধু আপনার হাতে। যদি কোনো নিষ্কলঙ্ক নারী তার কুমারী-হৃদয়ের সমস্ত অনাবিলতা লইয়া বহুদিন-সঞ্চিত প্রেমের নিশীথ-দহনে উন্মাদ হইয়া আপনার নিকট পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে, নীরব প্রতিবাদ দিয়া তাহাকে কি অগ্রাহ্য করিবেন? আমি কম্পিতহৃদয়ে আপনার উত্তরের আশায় চাহিয়া রহিলাম। আমার ঠিকানা....'

বায়রন এই সালঙ্কার চিঠির কোনো জবাব দিলেন না। এ সামান্য খেলায় মাতিবার তাঁহার সময় নাই।

কিন্তু যে-নারী স্বধর্ম রক্ষা করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে তাহার ধৈর্যচ্যুতি সহসে ঘটে না।

জেন দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিল : 'আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় বিশেষ প্রয়োজনে একজন নারী বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় আলোচনার জন্য লর্ড বায়রনের সঙ্গে একা দেখা করিতে চায়। লর্ড বায়রনের কি সুবিধা হইবে।'

বায়রন চাকর দিয়া খবর পাঠাইলেন যে তিনি শহর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

জেন তাহাতেও নিরুৎসাহ হইল না। জেন নিজের নাম দিয়া পুনরায় বায়রনকে লিখিল : 'আমি স্টেজে যোগদান করিতে চাই। আপনার সঙ্গে ডুরি লেন থিয়েটারের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে জানিয়া আপনার সাক্ষাতে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিতে চাই।'

বায়রন লিখিয়া জানাইলেন যে, তাঁহার সহিত দেখা করা অপেক্ষা স্টেজ-ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা ভালো।

জেন তাহাতেও দমিল না। বারবার প্রত্যাখ্যানে অপমানিত নারীত্ব পরাজয়ের গ্লানিকে আবরণ করিবার উদ্দেশ্য সর্বশেষবার নিবেদন করিল। সকল লজ্জা সকল শঙ্কা দূর করিয়া জেন এমনিভাবে আত্মনিবেদন করিয়া পত্র লিখিল যে তাহার অবমাননা করিতে যে-কোনো পুরুষের পৌরুষে আঘাত লাগে।

"....আমাকে আজ তোমার মনে হতে পারে যে আমি নির্লজ্জা, কিন্তু একদিন হয়তো জানতে পারবে যে, আমার প্রেম আর তোমার ভবিষ্যৎ একসঙ্গে গাঁথা.....

"আমি এক মতলব ঠিক করেছি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা আমরা দুজনে একখানা গাড়ি করে শহর ছেড়ে আট-দশ মাইলের মধ্যে কোথাও বেড়াতে যাব। সেখানে আমরা মুক্ত, কেউ আমাদের চেনে না। ভোরবেলাই আমরা ফিরে আসতে পারব। আমি এমন বন্দোবস্ত করেছি যে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

"....শুধু একমুহূর্তের জন্যে তোমার সঙ্গে থাকতে চাই...যে-মুহূর্তে তুমি চলে যেতে বলবে সেই মুহূর্তেই আমি চলে যাব।....তোমার যা ইচ্ছে হয় কর, নির্মম হতে পার

www.pathagar.com

হয়ো, কিন্তু জেনো, তোমার উদ্দাম আনন-শ্রী আমার মনকে চিরকালের মতো ঘিরে রেখেছে।"

জয়-পরাজয়ের খেলা বহুদিন এমনি ধারায় চলিয়া আসিবার পর অবশেষে বায়রন পরাজয় মানিয়া লইলেন। বায়রন তখন স্থির করিতেছিলেন যে, চিরকালের মতো ইংলন্ড ছাড়িয়া যাইবেন ; শুধু তাহার সর্বশেষ কারণটির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

এধারে ইংলন্ডে শেলির জীবন অসহ্য হইয়া আসিতেছিল ; তাহাদের দাম্পত্য জীবন গির্জার অনুমোদন পায় নাই বলিয়া তাহারা সমাজ-পরিত্যক্ত হইয়াছিল। শেলি ঠিক করিল ইংলন্ড ছাড়িয়া সে অন্যত্র কোথাও যাইবে—যেখানে মানুষ তাহাদের নর ও নারী হিসাবে সহজে গ্রহণ করিতে পারিবে, যেখানে প্রকৃতির মাতৃহৃদয়ে আত্মার সকল অভাবের অমৃত-আহার্য রহিয়াছে—বিশ্বসত্তার মঙ্গল-অস্তিত্বে-পূত সেই নির্জনতায় ফিরিয়া যাইবার জন্য শেলির মন আবার ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আত্মার এই অসীম ব্যাকুলতার মধ্যে Windsor Forest-এর ধারে, ওক গাছের তলায় বসিয়া শেলি *Alastor or The Siprit of Solitude* লেখে। নদ, নদী, গিরি-নির্ঝরিণী, লতা, পুষ্পপাতা, প্রকৃতির প্রত্যেকটি নব-নীল অভিব্যক্তি শেলির বীণার সুরে সুরে নবজীবন লাভ করিল—আত্মার মর্মসহচরী রূপে কলনির্ঝরিণী অনাদিকালের নিরুদ্ধ কথাটির আভাস আনিল ; নক্ষত্রের সুদূর জ্যোতি অন্তরের ছায়াপথ দিয়া অমৃতাকাঙ্ক্ষী মানবের নয়নে জ্বলিয়া উঠিল। যে-রহস্য ছিল তারায়, সে আসিল মিতালি করিতে মানবের নয়নে। যে বিশ্বসত্তা ছিল মানবের রচিত তন্ত্রে, রূঢ় আত্মগোপনে, কবির বীণায়, সে আজ ধরা দিল জীবনের অনাদি ধাত্রীরূপে। যে কবিকে নাস্তিক বলিয়া ইংলন্ড প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, কারণ আত্মার বিকাশের উপর সে গির্জার অনুশাসনকে স্বীকার করে নাই, তাহারই বীণায় বাজিয়া উঠিল মানবাত্মার শাশ্বত আকূতি।

কবির বীণা গাহিয়া উঠিল :

"হে পৃথিবী, হে সমুদ্র, হে আকাশ, মানবাত্মার হে সহোদরগণ,
যদি আমাদের সেই মহামাতা অন্তরে আমার
দিয়ে থাকেন সামান্যতম হৃদয়ের অনুভূতি,
যা দিয়ে আমি অনুভব করতে পারি তোমাদের প্রেম এবং
যার বলে
প্রতিদানে দিয়ে থাকি মানবহৃদয়ের এই সহজ প্রীতি—
যদি শিশিরস্নিগ্ধ প্রভাত, পুষ্পামোদে আবিষ্ট মধ্যাহ্ন,
সূর্যাস্তের সমারোহ-মহিমায় সুন্দর সন্ধ্যা,
নিবিড় নিশীথ-রাত্রের নীরবতার ওঙ্কার-ধ্বনি,
রিক্তপত্র-কাননে শরতের হৃদয়-উদাসী দীর্ঘশ্বাস,
তুষারের পূত শুভ্রতায়, রিক্তপত্রের মুকুট-মাথায় যদি শীত
আমার অন্তরের প্রিয় হয়ে থাকে—
যদি প্রথম-চুম্বন-চঞ্চল বসন্তের কামনা-আকুল হৃদয়োচ্ছ্বাস
অন্তরে আমার জাগিয়ে তুলে থাকে গোপন প্রীতির বন্ধন—
যদি কোনো পাখি, পতঙ্গ বা কোনো নিরীহ জীবকে

www.pathagar.com

আমি ইচ্ছাপূর্বক আঘাত না করে থাকি,
যদি তাদেরও মনে করে থাকি আমার আত্মার আত্মীয়,
তবে ক্ষমা কর আমার এই অহঙ্কার-উক্তি,
হে পৃথিবী, হে সমুদ্র, হে আকাশ,
আর ফিরিয়ে নিও না আমার কাছ থেকে
তোমাদের করুণার একটি কণাও।
হে জননী, অতলবিস্বসমুদ্রশায়িনী,
প্রসাদ বর্ষণ কর আমার এই হৃদয়-গভীর সঙ্গীতের উপর।
কেননা চিরদিনই আমি ভালোবেসেছি—
তোমাকে, শুধু তোমাকেই।
তোমার ছায়া, তোমার পদক্ষেপের
আঁধার মায়ার দিকে চিরদিনই চেয়ে আছি।
তোমার রহস্যের অতলস্পর্শ গভীরে
আমার চিত্ত হারিয়ে গেছে।
যেখানে কৃষ্ণবর্ণ মৃত্যু ধরণীর ভাণ্ডার থেকে
লুণ্ঠনলব্ধ ধনের বৃত্তান্ত লিখে রাখে,
সেই শ্মশানে শবের শয্যার পাশে আমার আসন পেতেছি—
শুধু এই আশায় যে তোমার কোনো
পথভ্রান্ত প্রেত-দূতের কাছ থেকে,
তুমি কে, কী আমাদের সম্বন্ধ, জোর করে
তা একদিন জেনে নেব।
... জানি, আজিও তোমার অন্তরতম মন্দিরের
রহস্য-দুয়ার উদঘাটন করতে পারলাম না,
কিন্তু এই-যে জীবনের অনির্বচনীয় স্বপ্ন,
এই-যে প্রদোষের সব ছায়ামূর্তি,
মধ্যদিনের আতপ্ত চিন্তাধারা,
এরা জীবনে আমার দীপ্যমান হয়ে উঠেছে।
নির্জন পরিত্যক্ত মন্দিরে বহুদিনের ভুলে-যাওয়া বীণাটির মতো,
আজ আমি তাই প্রশান্ত অন্তরে দাঁড়িয়ে আছি,
হে জননী, তোমার সেই অমৃত-শ্বাসে হৃদয়পাত্র ভরে নিতে,
যার তেজে আমার সঙ্গীত দুলে উঠবে বায়ুর তরঙ্গ-হিল্লোলে,
অরণ্যের প্রতি পল্লব-মর্মরে, সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গ-স্পন্দনে,
দিবস-রাত্রির গতির ছন্দে, মানবের হৃদয়ের
রক্ত-ধারার তালে।"

শেলির চিত্ত কল্পনার ধ্রুবলোকে প্রয়াণ করিত, এবং ক্রমশ তাহার আশপাশের ব্যবহারিক জগৎ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে হইত, ক্ষুদ্র তৃপ্তি লইয়া মানুষ জীবন্ত

www.pathagar.com

দেহে মৃত প্রাণশক্তির শব বহন করিয়া চলিয়াছে।

সেই মৃত মানুষের পৃথিবী হইতে—ইংলন্ড হইতে, শেলি স্থির করিলেন যে চলিয়া যাইবেন, দূরে নির্জন প্রবাসে।

জেন ভগিনীকে তাহার নূতন প্রেমের কথা সমস্তই বলিয়াছিল এবং বায়রনের জন্য সে জীবন উৎসর্গ করিবে তাহাও জানায়। অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া সে জানাইল যে সেও শেলিদের সঙ্গে প্রবাসে যাইবে ; এবং অনুমোদনের বিশেষ অপেক্ষা না করিয়াই শেলিদের সংসারে আসিয়া যোগদান করিল। কিছুদিন পরে একদিন আবার এই তিনটি প্রাণী ইংলন্ড ছাড়িয়া ফ্রান্সের মধ্যদিয়া সুইজারল্যান্ডের দিকে অগ্রসর হইল। জেনেভার উপান্ত প্রদেশে আসিয়া তাহারা *Hotel d' Angleterre*-তে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

হোটেলের বাতায়ন হইতে দূরে আল্‌প্‌সের চিরতুষার-ভূমি দেখা যাইত ; নিত্য প্রভাতে-সন্ধ্যায় সেখানে বর্ণের মেলা বসিত। হ্রদের স্বচ্ছ নীল জলে বোটে করিয়া শেলি অধিকাংশ সময় কাটাইত—মেরি ও জেনকে মহাকাব্যসমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃতরস পরিবেশন করিত। শেলি ভাবিল, এইখানেই আজীবন অতিবাহিত করিবে।

আল্‌প্‌সের কোলে বসিয়া যখন তাঁহারা এমনি নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যাকিরণ-মদিরা ভুঞ্জন করিতেছিল, সেই সময় ইংলন্ডের তীর হইতে চিরকালের মতো বিদায় গ্রহণ করিয়া 'চাইলড্ হ্যারলড্' বিরাট ঐশ্বর্যের বহর লইয়া সুইজারল্যান্ডে আসিতেছিলেন। বায়রনও ঠিক করিয়াছিলেন যে *Hotel d' Angleterre*-তে উঠিবেন।

বায়রন স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। যখন কোনো 'বল-রুমে' প্রবেশ করিতেন, মেয়েরা তখনই তাঁহাকে দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইত। অথচ তাঁহার নিভৃত অবসর নিত্য-নিয়মিত এই সমস্ত নারীর আত্মসমর্পণের আকূতিতে মুখর হইয়া থাকিত। বায়রন তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই ভণ্ডদের দেশে আর থাকিবেন না। গ্রিস তাঁহাকে ডাকিতেছিল, রোম তাঁহাকে ডাকিতেছিল।

সমাজ-পরিত্যক্ত হইয়া বায়রন ইংলন্ড ত্যাগ করিলেন। কিন্তু যে-সমাজ সামান্যতম নৈতিক বিচ্যুতির জন্য কোনো অপরাধীকে ক্ষমা করে না, সে-সমাজও অন্তরে অন্তরে তাহার বিদ্রোহী সন্তানদের প্রশংসা করে—অনেক সময় ঈর্ষাও করে।

তাই যেদিন বায়রন ডোভার হইতে জাহাজে উঠিলেন, সেদিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য দুই লাইন দিয়া কাতারে কাতারে লোক সমবেত হইয়াছিল। ঝি-দের পোশাক পরিয়া সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলারা সেদিন গোপনে সেই ভিড়ে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের জীবনের নায়ক-শ্রেষ্ঠকে শেষবার দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন।

'চাইলড্ হ্যারল্ড' যেদিন বৃহত্তর জগতের তীর্থপথে রওনা হইলেন সেদিন সমুদ্র অশান্ত ছিল। আকাশ ছিল গভীর মেঘে আচ্ছন্ন—সেই ঝঞ্ঝা, সেই চাঞ্চল্যের সুরে বায়রন ছন্দে আপনাকে পরমানন্দে নবজন্ম দান করিলেন।

হোটেলে চারিদিকে মহা হৈচৈ—সবাই উদগ্রীব হইয়া আছে কখন লর্ড বায়রন আসেন। জেনের অন্তর মুহুর্মুহু কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

বায়রন আসিলেন—দূর হইতে বায়রনের পুরুষ-সুন্দর মূর্তি দেখিয়া শেলি বুঝিল, এ তাঁহারই সহযাত্রী। হোটেলের খাতায় নাম সই করিবার সময় বায়রন বয়স লিখিলেন : 'একশো'।

শেলি ও বায়রনের পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইল এবং এই ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ দুইজনের অন্তরের

www.pathagar.com

পার্থক্যকে দুইজনের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল।

বায়রন দেখিলেন যে শেলি তাঁহারই মতো জ্ঞানের ভাণ্ডার মন্থন করিতে কোনো ত্রুটি করে নাই—কিন্তু যে-বিদ্যা বায়রন মানবকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য অর্জন করিয়াছিলেন শেলি আত্মপ্রসাদের জন্য তাহা আয়ত্ত করে। শেলির দুর্দমনীয় ইচ্ছাশক্তি, একমাত্র আত্মার সঙ্কেতে চলিত—বায়রন তাঁহার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি তাঁদের প্রবৃত্তি ও তাঁহার প্রেয়সীদের করুণার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বায়রন তাহা জানিতেন এবং অন্তরের নিভৃতলোকে তাই শেলিকে শ্রদ্ধা করিতেন। শেলি ভাবিয়াছিল যে বায়রনের মধ্যে এক বিরাট কঠোর বিপ্লবীকে দেখিতে পাইবে—মিল্টনের Satan বায়রন-এর মতো যে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী—কিন্তু তাহার বদলে দেখিল, একজন অপমানিত অভিজাত—সংস্কারকে সে নির্মমভাবে পদাঘাত করে, কিন্তু সংস্কারের মোহ তাহার অন্তর ঘিরিয়া আছে। শেলির বিপ্লবের পশ্চাতে ছিল প্রজ্ঞা, বায়রনের বিপ্লবের পশ্চাতে ছিল প্রবৃত্তি।

শেলি নারীকে আত্মার সহচরী বলিয়া জানিত, বায়রন নারীকে দেখিয়াছিলেন কামনার নর্ম-সহচরী। তাই শেলি নারীকে দেবীরূপে দেখিতে চাহিত, বায়রন নারী লইয়া পুতুল-খেলা করিতেন। বায়রন বলিতেন তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ আছে যে মেয়েদের আত্মা আছে কিনা। শেলি গাহিত নারীর আত্মার নব নব অভিব্যক্তির কাহিনী—সৃষ্টির অন্তঃপুরবাসিনী বিশ্ব-রমার অনন্ত রাগলীলা।

তবুও জগতের এই দুই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি পরস্পর পরস্পরকে অন্তরের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। প্রতি সন্ধ্যায় শান্ত স্বচ্ছ নীলে একদল তরুণ-তরুণী জগতের সমস্ত সংস্কার হইতে দূরে তরণী বাহিত—জেন গান গাহিয়া সন্ধ্যার তরল আলোকে মদিরসিক্ত করিয়া তুলিত, দাঁড়ে বসিয়া জগতের দুই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি উদয়-তারার আবির্ভাব সঙ্গীত রচনা করিত।

কিছুদিন পরেই হোটেলের জীবন আর ভালো না-লাগায়, দুই বন্ধুতে একটি আলাদা বাড়ি ভাড়া লইল। দুইজনের বাড়ির মাঝখানে শুধু একটি আঙুর-ক্ষেত।

একদিন ভোরবেলায় আঙুর-ক্ষেতে যে-সমস্ত চাষারা কাজ করিতেছিল, তাহারা দেখে যে একটি মেয়ে শ্বেতবসনে বায়রনের বাড়ি হইতে দৌড়াইয়া শেলিদের বাড়ি আসিয়া ঢুকিল। দৌড়াইয়া আসিবার সময় জেনের একপাটি চটিজুতা পা হইতে খুলিয়া পড়িয়া গেল। লজ্জায় জেন আর তাহা কুড়াইয়া লইতে পারিল না। চাষারা ব্যাপারটা বুঝিল এবং এই সরল ব্যাপারটা যাহাতে সকলে উপভোগ করিতে পারে, সেইজন্য তাহারা ইংরেজ-কুমারীর সেই একপাটি জুতা সবিশেষ বিবরণসহ মেয়রের অফিসে জমা দিয়া আসিল।

বায়রন জেনকে দূরে রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জেনের প্রেমে অধ্যবসায় থাকার দরুন জেন জয়ী হইল বটে কিন্তু সে-জয়কে বেশিদিন সে ভোগ করিতে পারিল না। বায়রন ক্রমশ জেনের প্রেমসাধনায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিলেন, বায়রন ডায়েরিতে লিখিলেন : ট্রোজান যুদ্ধের পর আমার চেয়ে জীবননাট্যে বেশি বিধ্বস্ত আর কেহ হয় নাই। লোকে আমার কুৎসা রটনা করে যে আমি নারী সম্বন্ধে বড়ই নির্মম। হয়তো তাহা সত্য কিন্তু সবসময়ে আমিই তাহাদের বলি হইয়াছি। আমার কামনার চেয়েও তাহাদের অধ্যবসায় ঢের বেশি প্রবল।

জেন সন্তানসম্ভবা হইল। শেলি লক্ষ করিয়াছিল যে বায়রন জেনের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকবার চেষ্টা করিতেছেন। জেনের জন্য ততটা নয়, যতটা সেই অনাগত শিশুটির জন্য শেলির ভাবনা হইল এবং একদিন শেলি এই ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব বায়রনকে বলিল। বায়রন

www.pathagar.com

স্পষ্টই জানাইলেন যে যত শীঘ্র সম্ভব এবং যে-কোনো উপায়ে সম্ভব, জেনের হাত হইতে তিনি রক্ষা পাইলেই বাঁচেন। অনাগত শিশুটির সমস্ত দায়িত্ব লইতে অবশ্য তিনি রাজি আছেন, তবে এই শর্ত যে সে-শিশুর উপর জেনের কোনো দাবি বা কর্তৃত্ব থাকিবে না।

ক্রমশ জেনের ব্যাপারকে উপলক্ষ করিয়া শেলিদের সহিত বায়রনের মনোমালিন্য দেখা দিতে লাগিল। বায়রনের ব্যবহারে জেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া মেরিও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বায়রনের কথাবার্তার মধ্যে নারীজাতির বিরুদ্ধে যে তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিত, তাহা সহ্য করা মেরি উলস্টোনক্রাফটের কন্যার পক্ষে ক্রমশ অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। একদিন কথায় কথায় বায়রন বলিলেন, পুরুষমানুষের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাবারও অধিকার মেয়েদের নেই। তাদের উপযুক্ত স্থান হচ্ছে ঘরের মধ্যে, রান্নাঘরে। মেরি রাগে কাঁপিয়া বায়রনের কোনো কথার জবাব দিতে পারিল না।

বায়রনের আচরণে এইরকমভাবে আহত হইয়া মেরির মন আবার পিতৃভূমির জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। শেলিরা ঠিক করিল যে আবার তাঁহারা ইংলন্ডে ফিরিয়া যাইবে। বাড়ি বন্দোবস্ত করিবার জন্য বন্ধু হগ্‌কে পত্র লিখিয়া যাযাবর যাত্রীর দল আবার ইংলন্ডের পথে রওনা হইল।

শেলিরা চলিয়া যাইবার পর বায়রন জেনের সম্পর্কে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া তাঁহার ভগ্নীকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে বলেন যে : 'এ ব্যাপারে আমি আর কী করিতে পারি বল? একটা হাঁদা মেয়ে, আমি যতবার বারণ করেছি কোনোদিন তা গ্রাহ্য করে নি—আমার পিছু পিছু, পিছু পিছু কেন আমার আসার আগেই সে এসে বসেছিল। যত রকমে পারি, তাকে ফিরাতে চেষ্টা করেছি। তখন সে ফেরে নি—অবশ্য আজ সে ফিরে গেছে। আমি কোনোদিন তার প্রেমে পড়ি নি, আর কোনো স্ত্রীলোকের প্রেমে পড়বার প্রবৃত্তি আমার নেই। কিন্তু যে-মেয়ে আমাকে ধরবার জন্যে আটশো মাইল চলে এসেছে, তাকে ধরা না দিয়েই বা আমার উপায় কী ছিল?"

শেলির জীবননাট্যের সুমেরু-শিখরে কাব্যের উপেক্ষিতার মতো আর একটি নারী প্রভাতের শুকতারার ন্যায় সমস্ত আকাশের অশ্রুসজলতা লইয়া একবার ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মেরি ও জেনের আর একটি ভগ্নী ছিল, তাহার নাম ফ্যানি। ফ্যানির জন্মবৃত্তান্ত রহস্যজনক। গডউইনের প্রথম স্ত্রীর প্রণয়ীর ঔরসে ফ্যানি জন্মগ্রহণ করে। গডউইনের প্রথম স্ত্রী এই কন্যাটিকে এই সংসারে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। সেই হইতে ফ্যানি, মেরি ও জেনের সঙ্গে লালিত-পালিত হইয়া আসিয়াছে। কুমারী জননীর বাসনার ঝড়ে সে উড়িয়া আসিয়া ভ্রষ্ট-কুসুমের মতো এই সংসারের মধ্যে পড়িয়াছিল, সেখানে তাহার অন্তরের ব্যথী কেহ ছিল না। সংসারের একধারে আপনার জীবনের ভ্রষ্টলগ্নের গ্লানি বহিয়া সে কোনোরকমে ছিল, কিন্তু মেরি ও জেনের প্রণয়-প্রবাস তাহার নিঃসঙ্গ জীবনকে অপরিপূর্ণতার বেদনায় দুঃসহ করিয়া তুলিল।

গডউইন এবং তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর, মেরি ও শেলির উপর যত রাগ জমা হইয়াছিল, তাহা সমস্তই ফ্যানির উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সুইজারল্যান্ডের স্বচ্ছ আকাশের নিম্নে স্বপ্ন-তরণী বাহিয়া যখন শেলি, মেরি ও জেন কাব্যের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছিল, সেই সময় লন্ডনের এক দরিদ্র পরিবারে সঙ্গীহীন নির্জনতার মধ্যে আর এক যুবতী সারাদিন ধরিয়া তাহাদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করিত। কোনোরকমে একটা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ জুটিল, কিন্তু মেরি ও জেনের ভগ্নী বলিয়া পরিচয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে চাকরি গেল। ব্যর্থ যৌবনের

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর নিপীড়নে ফ্যানি সারারাত জাগিয়া থাকিত। শূন্য আকাশের দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার কল্পনায়, সেই নিশীথ আকাশ সুইজারল্যান্ডের হ্রদে পরিণত হইয়া যাইত। ছায়ালোকের পথ দিয়া ফ্যানি দেখিত, তরণী চলিয়াছে; তরণীতে উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে প্রেমের নিশীথ-বাসরে রহিয়াছে শেলি ও মেরি, জেন ও বায়রন; তাহাদের চারিদিক দিয়া নক্ষত্রগুলি স্রোতের ফুলের মতো ভাসিয়া চলিয়াছে; স্বয়ং মহাকাল আনন্দের ছন্দে সে-তরণীর দাঁড় বাহিয়া চলিয়াছে। ফ্যানির গায়ে হাওয়া লাগে—ফ্যানি স্পষ্টই অনুভব করে যে, সে-হাওয়া যেন সুইজারল্যান্ডের সেই হ্রদ হইতেই আসিতেছে; কানে তাহার সুর বাজিয়া ওঠে—সে স্পষ্টই শোনে, মহাকালের তরণী-বাওয়ার ছন্দে শেলি সঙ্গীত রচনা করিতেছে—বায়রন তরঙ্গের স্রোতের প্রাণ অপহরণ করিয়া ছন্দে তাহার নররূপ দিতেছে—সেই সুর, সেই আলো, সেই স্পর্শ, সেই অনুভূতি—পুষ্পিত যৌবনের সেই বাসন্তী-বিকাশ—

রাত্রি জাগিয়া ফ্যানি মেরিকে চিঠি লেখে। লেখে—'বায়রনের সম্বন্ধে তুই যা লিখেছিস, তা সবই কি সত্যি? কেমন তাঁর কণ্ঠস্বর? তোদের বাড়িতে যখন আসেন, তখনো তেমনি উদাস, আলুথালু বেশ? লোকে এখনও তাঁকে যে-চোখে দেখে, নিশ্চয়ই তিনি তা নন। শেলির নৌকা-বিহার। হায়, আমি যদি সেখানে থাকতে পারতাম! যদি শেলির সঙ্গীত-রচনার জন্মলগ্নে আমি মঙ্গলশঙ্খ বাজাতে পারতাম। শেলির কবিতা কবে এখানে ছাপা হবে? আমি কি তাঁর হাতের লেখা দেখতে পাব না? কবিতা যখন পড়ি, তখন মনে হয় আমিও কবি। আমার মনের মধ্যে কী এক সুর জেগে ওঠে। মনের কানে কানে সে এসে বলে, এই প্রতিদিনের তুচ্ছ দেনা-পাওনার বাইরে অন্তরে মহা-ঈপ্সিতের মরকত-মণি রয়েছে—যেদিন কেহ তার স্পর্শ পাবে, সেইদিনই এই পৃথিবী সুন্দরতম হয়ে উঠবে—'

ফ্যানির এই সমস্ত পত্র পড়িয়া মেরি ও শেলি শুধু করুণায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিত। ফ্যানির অসহায়-বন্ধনদশার কথা ভাবিয়া মেরি নিজের দিকে চাহিয়া মুক্তির বিরাট স্বচ্ছতার মধ্যে তৃপ্তি বোধ করিত। সুইজারল্যান্ড হইতে ইংলন্ডে ফিরিয়া আসিবার পথে জেনেভায় তাহারা কয়েকদিন অবস্থান করিল। ফ্যানির কথা স্মরণ করিয়া মেরি শেলিকে দিয়া ফ্যানির জন্য একটি হাতঘড়ি কিনাইল। মেরি হয়তো ভাবিয়াছিল যে ফ্যানির অন্তরের আকূতি এই ঘড়িতেই মিটিবে!

ইংলন্ডে আসিয়া শেলি ঠিক করিল যে বাথ নগরে তাহারা অবস্থান করিবে। লন্ডন হইয়া যাইবার সময় ফ্যানি আসিয়া তাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিল। বিষণ্ণতা মূর্তিমতী, জগতে যেন তাহার চাহিবার, বলিবার কিছুই নাই। সামান্য যেটুকু আলাপ হইল, তাহাতে সে জানাইল যে জগতের একান্ত নিষ্প্রয়োজনীয় পদার্থ সে। বিদায়ের কালে শেলির সহিত কথা বলিবার সময়, তাহার সর্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল; অন্তরে যে-কথা বলিবার ছিল কিসে যেন সমস্ত ব্যাহত হইয়া শুধু দেহের কম্পনে তাহা ভাঙিয়া পড়িল।

শেলিরা চলিয়া গেল। বাথ নগরে অবস্থানকালে শেলি ব্রিস্টল হইতে এক পত্র পাইল। ফ্যানির স্বাক্ষরে শুধু লেখা—'আমিও যাত্রা করিলাম—তবে আমি যে-দেশে যাইতেছি, সেখান হইতে আর ফিরিব না!'

এই পত্র পাইয়া তাহারা সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। শেলি কালবিলম্ব না করিয়াই ব্রিস্টলে আসিল। সেদিন ব্রিস্টলে কোথাও ফ্যানির কোনো সন্ধান পাইল না। পরের দিন আবার গেল। সেদিন ফ্যানির সংবাদ পাওয়া গেল। ব্রিস্টল হইতে ফ্যানি সোয়ানসিতে এক হোটেলে গিয়াই

www.pathagar.com

ওঠে। হোটেলে গিয়াই পরিচারিকাকে বলে যে, সে ভয়ানক ক্লান্ত, বিশ্রাম করিতে চায়, কেউ যেন তাহার বিশ্রাম ভঙ্গ না করে।

সকালে পরিচারিকা দেখে, বেলা পর্যন্ত ফ্যানির ঘরের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। ডাকিলেও সাড়া নাই। অবশেষে দরজা ভাঙিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করা হইল, তখন দেখা গেল যে ফ্যানির মৃতদেহ মাটিতে বিশ্রাম করিতেছে—মাথার উপরে এলোচুলের মধ্যে শেলির দেওয়া ঘড়িটি টিক্‌টিক করিয়া চলিতেছে। টেবিলে শূন্য বিষের পাত্র, আর একখানি অসম্পূর্ণ চিঠি। চিঠিতে লেখা : 'বহুবার ভেবেছি যে, আমার বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা নেই। জন্ম আমার কলঙ্ক-চিহ্নিত, জীবন আমার অসম্পূর্ণ-আশার বেদনায় কণ্টকিত। আমার মৃত্যু-সংবাদ যখন তুমি পাবে, হয়তো তখন সামান্য দুঃখবোধ হবে তোমার, কিন্তু আমি জানি, একদিন আমার মতো কেউ-যে বেঁচে ছিল সে তুমি অচিরেই ভুলে যাবে ...'

ফ্যানির মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া গডউইনের স্ত্রী শেলিকে গালাগালি দিয়া এক পত্র লেখেন। পত্রে তিনি ফ্যানির এই আত্মহত্যার জন্য শেলিকেই দায়ী করেন।

ফ্যানির এই আকস্মিক মৃত্যুতে শেলির মনে নিদারুণ আঘাত লাগে। তাহার উপর পরোক্ষভাবে ফ্যানির এই ব্যর্থতার জন্য নিজেকে দায়ী ভাবিতে শেলির মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

ঠিক এমনি সময়ে শেলি আর একখানি পত্র পাইল।

দুইমাস হইল সে হ্যারিয়েটের কোনো খবর পায় নাই। ব্যাংক হইতে মার্চ ও সেপ্টেম্বর মাসে সে তাহার বরাদ্দ টাকা লইয়াছে—কিন্তু তাহার পর হইতে তাহার আর কোনো খবর নাই। তাহার খবর লইবার জন্য শেলি একজনকে পত্র লিখিয়াছিল, তাহারই উত্তর আসিয়াছে। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন :

> 'মহাশয়, একমাস পূর্বে আপনার পত্র পাইয়াছিলাম। কিন্তু এ যাবৎ মিসেস শেলি এবং আপনার সন্তানদের কোনো খবর না-পাওয়ার দরুন আপনাকে পত্র দিতে পারি নাই।
>
> আমি যখন মিসেস শেলির অনুসন্ধান করিতেছিলাম, সেই সময় হঠাৎ একদিন খবর পাইলাম যে মিসেস শেলি আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রথমে বিশ্বাস করি নাই, পরে তদন্ত করিয়া জানিলাম যে ব্যাপার সত্য। গত মঙ্গলবার সার্পেন্টাইন নদী হইতে তাঁহার মৃতদেহ তোলা হইয়াছে।....'

যন্ত্রচালিতের মতো শেলি লন্ডনে আসিল। পথে আসিতে আসিতে অবসন্ন মস্তিষ্কে শুধু হ্যারিয়েটের সেই শিশুসুলভ সুন্দর মুখখানি ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেই একরাশ এলোচুলের মধ্যে প্রভাত-নলিনীর মতো স্বচ্ছ, সুন্দর, পবিত্র মুখ—

শহরে আসিয়া টাইম্‌স্ পত্রিকায় সংবাদে দেখিল, 'গত মঙ্গলবার সার্পেন্টাইন নদীতে একজন গর্ভবতী নারীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মৃতা রমণীর হাতে একটি বহুমূল্যের অঙ্গুরীয় ছিল। তাহার স্বামীর প্রবাস-অবস্থানে কোনো চরিত্রগত স্খলনের লজ্জাই এই আত্মহত্যার কারণ বলিয়া মনে হয়।'

শেলি হ্যারিয়েটের সম্পর্কে যে-সমস্ত কাহিনী অবগত হইল, তাহার সারমর্ম এই যে—শেলি যে-সমস্ত চিঠি হ্যারিয়েটকে লিখিত, বাড়িওয়ালি তাহা হ্যারিয়েটকে দিত না। অবশেষে যে-পথে অসহায় নারীত্ব দুর্বল মুহূর্তে আত্মবিসর্জন করে, সেই পথে শেলির প্রেয়সী নামিয়া আসে।

www.pathagar.com

প্রথমে একজন সৈন্যবিভাগের কর্মচারীর সহিত হ্যারিয়েট বসবাস করে। কিছুদিন পরে কর্মচারীটিকে কার্যগতিতে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতে হয়। আপনার বোঝা আপনি বহিবার সামর্থ্য না-থাকায়, হ্যারিয়েট অবশেষে এক সামান্য ঘোড়ার গাড়ির চালকের আশ্রয়ে থাকে। সেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সন্তানেরা বাপের বাড়ি থাকিত, তাহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করাও নিষিদ্ধ ছিল। অবশেষে গর্ভাবস্থায় নদীর জলে হতভাগিনী সর্বশেষ আশ্রয় খুঁজিয়া লয়।

ফ্যানি ও হ্যারিয়েটের অপমৃত্যু শেলির সমস্ত চিন্তাধারাকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল।

মানুষ যে-মুহূর্তে অন্তর হইতে সমস্ত সংস্কার ভাঙিয়া ফেলে সেই মুহূর্তে তাহার অন্তরের আর-একদিকে নানাপ্রকারের অজানা শক্তি ও প্রবৃত্তি মাথা তুলিয়া ওঠে। এই সমস্ত সদ্য-জাগ্রত শক্তিকে আয়ত্তে রাখিতে না পারিলে, ইহারা নবজাগ্রত গতিবেগে আপনাদের কাজ সমাপন করিয়া চলিয়া যায়। দুর্বল যদি সংস্কারহীন হয়, তাহা হইলে, মৃৎভাণ্ডের মতো সে সেই গতির বেগে কোথায় তলাইয়া যায়।

হ্যারিয়েটের অপমৃত্যুর এক পক্ষকাল পরে শেলি ও মেরি একদিন সেন্ট মিলড্রেডের গির্জায় গিয়া খ্রিস্টান আইন অনুসারে তাহাদের মিলনকে সামাজিক বিবাহের গৌরব দান করে। শেলি আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সামাজিক আইন যাঁদের হাতে তাঁহারা জানাইলেন যে, যে-মিলনকে প্রকৃতি দুইবার আশীর্বাদ করিয়া ফলবতী করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে অনুমোদন করিবার জন্য, সামাজিক আইন আর বেশিদিন বিলম্ব করিতে পারে না।

এই বিবাহের অনুষ্ঠানের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সন্তানদের উপর তাঁহার অধিকার আইনের চোখে প্রতিষ্ঠিত করা, আইনত ইহার একটি প্রধান অন্তরায় ছিল যে, শেলি ও মেরির সম্বন্ধ। হ্যারিয়েটের পিতৃপক্ষ হইতে তাহার দুইটি সন্তানের মারফতে আদালতে আবেদন করা হয় যে, 'আমাদের পিতা নিজেকে নাস্তিক বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তিনি কুইন ম্যাব নামক একখানি বই লিখিয়াছেন, যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বিবাহ এবং জীবনের অন্যান্য সমস্ত নীতিকে অস্বীকার করা হইয়াছে।' অতএব সেই তিন বৎসরের মেয়ে ও দুই বৎসরের ছেলের আবেদন যে, তাহারা অমন পিতার আশ্রয়ে থাকিতে চায় না।

আদালতের বিচারে শেলির দাবি টিকিল না। দুর্নীতিপরায়ণ পিতা পুত্রের ভার লইতে পারে না।

এই সমস্ত ঘটনা শেলির মনকে ধীরে ধীরে এই মানুষের পৃথিবী হইতে দূরে, বহুদূরে কল্পনার এক অদৃশ্য ধ্রুবলোকে লইয়া চলিয়াছিল। যতবার সে এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হইতে গিয়াছে, ততবারই সে বাধা পাইয়াছে। যতবার মানুষের সহিত সে অন্তরের একান্ত সরলতা লইয়া মিশিতে গিয়াছে, নির্মম নীচতার অঙ্কুশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ততবারই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। তাই এই প্রত্যক্ষ, এই স্থূল, এই প্রতিদিনের তুচ্ছ দেনা-পাওনার জগৎ হইতে শেলির মন মুক্ত বিহঙ্গমের মতো চলিয়াছিল মেঘলোকের ওপারে ছায়াপথ ধরিয়া কল্পনার ধ্রুবলোকে, যেখানে শাশ্বত সত্য অপ্রতিহত গৌরবে অনন্ত সৌন্দর্যের সিংহাসনে বসিয়া আছে; এই পৃথিবীর ক্লেদক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর যেখানকার অমৃতস্বাদবাহী পবনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। শেলির চিত্ত তাই দীপশিখার মতো ঊর্ধ্ব আকাশের তারার সহিত মিতালি করিতে

www.pathagar.com

চাহিত, মধ্যখানের শূন্যগর্ভ ব্যবধান সেই সুদুর্লভের আকাঙ্ক্ষার আকূতিতে ও ব্যথার বাষ্পে ভরিয়া যাইত। রাত্রি যেমন আপনার ধ্যান-মৌনতার মধ্যে দিবসের আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষা করে, শেলির চিত্ত তেমনি এক মহিমাময় আবির্ভাবের জন্য আপনার অন্তরে অভিনব স্বর্গলোক রচনা করিয়া ছন্দে ছন্দে তাহার ধ্যানমন্ত্র রচনা করিল—যে অপরূপ আবির্ভাবে সহসা একদিন এই পৃথিবী ও স্বর্গের রহস্যময় ব্যবধান দূর হইয়া যাইবে, যাহার সামান্য লীলাসঙ্কেতে প্রেম নিরঙ্কুশ হইয়া ফুটিয়া উঠিবে ; মানব আপনাকে দেবতার সহচর বলিয়া পুনরায় চিনিয়া লইতে পারিবে।

আদালতে যখন বিচার চলিতেছিল, তখন শেলির বড় সাধ যায়, নির্জন গ্রামের ধারে নিজের একখানি ছোট বাড়িতে অবশিষ্ট জীবন স্বেচ্ছাকৃত নির্বাসনে অতিবাহিত করিবে। সেই উদ্দেশে যাযাবর পথিক একদিন গ্রেট মারলো শহরে একটি ছোট্ট বাড়ি কিনিয়া ফেলিল।

এইখানে জেনের একটি সন্তান হইল—শেলি বায়রনকে লিখিয়া জানাইল কিন্তু তাহার কোনো উত্তর আসিল না।

বিচারের পর শেলির দেহ ও মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

জীবনের সহিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বাস্তবতার সম্বন্ধে শেলির মনে এক আতঙ্ক জাগিয়া উঠিল। যখনই একান্ত বিশ্বাসে ও পরম নির্ভরতায় কোনো কাজ করিতে গিয়াছে—কোথা হইতে কুৎসিতের তরঙ্গ-আঘাতে বিপর্যস্ত হইয়া তাহা বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। এবং যত দিন যাইতে লাগিল শেলির অন্তর ও তাহার চারিপাশের জগতের সহিত ততই বিরোধ বাধিতে লাগিল।

অন্যদিকে তাহার অন্তরের উদারতার আশ্রয়ে ধীরে ধীরে একটি সংসার ক্রমশ তাহার সমষ্টির সংখ্যা বাড়াইয়াই চলিয়াছিল। মেরি, শেলি এবং মেরির ছেলেরা ছাড়া, ছিল জেন ও তাহার মেয়ে। এছাড়া গডউইন-পরিবারের সমগ্র অর্থনৈতিক দায়িত্ব কোথা হইতে শেলির ঘাড়েই আসিয়া পড়িল। নতুন সাহিত্যিক বন্ধু লি হান্টের পাঁচটি ছেলেমেয়ে, নিদারুণ অর্থাভাব; তাহাকেও নিয়মিত সাহায্য করিতে হয়। পিককে বৎসরে একশো পাউন্ড দিতে প্রতিশ্রুত—কেননা, তাহা হইলে হয়তো সে নির্ভাবনায় লিখিতে পারে।

এইরূপ অবস্থায় পুনরায় শেলির আর্থিক অনটন দেখা দিতে লাগিল। ক্রমশ যত দিন যাইতে লাগিল শেলির মনে হইতে লাগিল ইংলন্ডে যেন সে বন্দি হইয়া আছে। আইনত সে ইংলন্ডে অস্পৃশ্য, আপনার সন্তানদের ভার লইবারও অধিকার তাহার নাই। ইতালির স্বচ্ছ নীল আকাশ, মুক্ত জীবন, আবার বাতাসে তাহার আহ্বান পাঠাইল। শেলির মনে হইল ইংলন্ড হইতে চলিয়া যাইতে পারিলেই, আবার যেন তাহার জীবন নবরূপে বিকশিত হইয়া উঠিবে—নূতন আকাশের তলায় নূতন জীবন জাগিয়া উঠিতে পারে।

মেরিও মনে মনে তাহাই চাহিতেছিল। ফ্যানি ও হ্যারিয়েটের অপমৃত্যু এবং তাহার সহিত জড়ানো সমস্ত কলঙ্ক-কাহিনী যেন তাহাদের মিলনকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য তাহাদের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বিশেষ করিয়া বায়রনের মেয়ে, আলবার অস্তিত্বে মেরিকে আরও সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইত। যে লোকই আসিত, সেই এই মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিত। মেরি বলিত, মেয়েটি লন্ডনের এক ভদ্রলোকের মেয়ে। মা মারা যেতে আমাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু জেনের হাবভাব ও শিশুর মুখের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখিয়া কাহারও বুঝিতে

www.pathagar.com

বিলম্ব হইত না যে, মেয়েটি জেনের এবং সেইসঙ্গে তাহারা আপনার মনে সিদ্ধান্ত গড়িয়া লইত যে মেয়েটির জনক নিশ্চয়ই শেলি। মাতার বিষয়ে আগন্তুকদের মনে কোনোরূপ সন্দেহ থাকিলেও পিতার বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহের অবকাশ তাহাদের মনে ঠাঁই পাইত না।

এই সমস্ত কারণে মেরি ঠিক করিয়াছিল কোনোরকমে বায়রনকে বুঝাইয়া আলবাকে তাহার নিকট রাখিয়া দিবে। অবশেষে ঠিক হইল যে, আর কালবিলম্ব নয়, আবার ইতালির পথে, ইতালির আকাশের তলে, চিরমুক্তির মধ্যে ...

স্রোতস্বিনী সাগর-সমর্পিতা

শেলিরা যখন বায়রনের অনুসন্ধানে ইতালির দিকে চলিতেছিল ; সেই সময় লর্ড বায়রন মধ্যযুগের রাজাবাদশাহ্‌দের মতো ভিনিসে রাজকীয় বিলাসিতার মধ্যে আপনার ব্যক্তিত্বকে নানাদিক দিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছিলেন। নারী সম্বন্ধে তাঁহার খ্যাতি তখন য়ুরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার রূপ, ঐশ্বর্য, কামনা ও আকাঙ্ক্ষার শতসহস্র কাহিনী নানা রূপ পরিগ্রহ করিয়া ভিনিসের সরাইখানা হইতে ডাচেসের অন্তঃপুর পর্যন্ত বিচরণ করিতেছিল। বিদেশি পর্যটকগণ বায়রন কোন্ শয্যায় শয়ন করে, তাহা দেখিবার জন্য চাকরদের ঘুস দিয়া বায়রনের অবর্তমানে তাহার বাড়িতে ঢুকিয়া আপনাদের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিত।

যেদিন বায়রন ভিনিসে আসেন, সেই দিন তিনি একটি গন্ডোলা কেনেন এবং সেখানকার একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর স্ত্রীর সহিত অধিকাংশ সময় সেই নৌকাতেই অতিবাহিত করিতেন। বস্ত্র-ব্যবসায়ীর তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না, কারণ বস্ত্র-ব্যবসায়ের ক্ষতি স্ত্রী ষোলো আনাই পূরণ করিয়া দিত। এবং সেখানকার মতে স্ত্রীর একজন প্রেমিক থাকা এমন কিছু দোষাবহ নহে। লোকে বলাবলি করিত যে নগরের মধ্যে কোথাও এই ইংরাজ লর্ড একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা কিনিয়াছেন, সেখানে কাব্যের প্রেরণার জন্য—একটি নয়, অনেকগুলি সজীব প্রেরণা নিশীথে বিচরণ করে।

এই অবস্থায় পুনরায় শেলির সহিত বায়রনের দেখা হইল। আলবাকে তাহার নিকট রাখিবার প্রস্তাবে শেলি বায়রনকে অনেক কষ্টে রাজি করাইল। তবে সে কোনোমতে জেনের সঙ্গে দেখা করিতে বা তাহাকে দেখা দিতে রাজি হইল না।

বহুদিন পরে দুই বন্ধুতে একত্রে আবার ভ্রমণে বাহির হইল। আড্রিয়াটিকের তীরবর্তী বালুময় এক দ্বীপ আছে। সেইখানে নৌকা হইতে দুই বন্ধু অবতরণ করিল। চারিদিকে উদাসীন নির্জনতা। সম্মুখে বায়রনের ঘোড়া প্রস্তুত ছিল। দুই বন্ধুতে সেই উদাসীন নির্জনতার মধ্যে পরিভ্রমণে বাহির হইল।

শেলির সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বায়রন বলিলেন, 'এ আমার বন্ধু-ধারণা, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা নিয়েই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। মানুষের কাছ থেকে তাছাড়া অন্যকিছু প্রত্যাশা যে করে, তাকেই লোকে স্বপ্নবিলাসী বলে।'

দূরে সূর্যকিরণে বালুকাগুলি ঝকমক করিতেছিল—সেইদিকে চাহিয়া শেলি বলিল, 'আমার

www.pathagar.com

ধারণা কিন্তু অন্যরকম। মানুষ স্বভাবতই পাপপ্রবণ হলেও, এই স্বভাবপ্রবৃত্তিকে দমন করাবার জন্যই প্রবৃত্তির উপর আত্মার ধর্ম আছে।'

অপরাহ্নের রক্ত-আলোর রূপরহস্যময়ী ভিনিস তখন যেন সূর্যকিরণের তরল মদিরায় অবগাহন করিতেছিল। বায়রন পিছন ফিরিয়া বলিলেন, 'চল আবার নৌকায় ফিরে যাই, তোমাকে একটা জিনিস দেখাব।'

কিছুক্ষণ নৌকা বাওয়ার পর শেলি দেখিল যে একটি জনহীন বালুময় দ্বীপে একটা অতি পুরনো বৃহৎ অট্টালিকা রহিয়াছে। অট্টালিকাটির কোথাও জানালা দেখা যাইতেছে না। উপরে একটা চূড়ায় একটা বৃহৎ ঘণ্টা বাঁধা।

সেই অট্টালিকার দিকে চাহিয়া বায়রন বলিলেন, 'ঐ-যে বাড়িটা দেখছ, ওটা পাগলা-গারদ। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় আমি যখন এখান দিয়েই যাই, আমি শুনি ঘণ্টা বাজছে, পাগলদের সান্ধ্য-উপাসনার সময় হয়েছে জানাবার জন্যে।'

শেলি হাসিয়া বলিল, 'বড় ভালো বন্দোবস্ত তো। ঈশ্বর ওদের পাগল করে দিয়ে যে করুণা দেখিয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতার বেশ ভালো ব্যবস্থাই বলতে হবে।"

বায়রনও হাসিয়া বলিলেন, 'সেই নাস্তিক শেলি একতিলও বদলায় নি। কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তুমি সাঁতার জানো না, তুমি দৈবকে ওরকমভাবে জলে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞা কোরো না। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে প্রবৃত্তিকে জয় করার কথা, তোমার কি মনে হচ্ছে না যে, এই-যে চোখের সামনে দৃশ্য দেখছ এই আমাদের জীবনের প্রতীক। প্রতি সন্ধ্যায় এমনিভাবে বিবেকের শঙ্খধ্বনি জাগে—পাগলের অভ্যাসের মতো ক্ষণিকের জন্যে আমরা সেই ধ্বনিতে সাড়া দিয়ে উঠি, কেন যে উঠি তা জানি না। তারপর কখন সূর্য অস্ত যায়, শঙ্খধ্বনি আর শোনা যায় না, মরণের নিশীথ-লগ্নে সমস্তই একাকার হয়ে আসে।'

সেই জনহীন নীরবতার মধ্যে সন্ধ্যার মৃদু আগমনীর তালে ধীরে অতি ধীরে শুধু দাঁড়-বাওয়ার শব্দ হইতেছিল। সম্মুখের জলে দিনের চিতাগ্নি জ্বলিয়া ওঠে। শেলি ব্যতীত আর কাহাকেও শুনাইবার জন্য যেন বায়রন চিৎকার করিয়া বলিলেন, 'আমরা বায়রনের বংশ খুব তাড়াতাড়ি মরি। আমার বাবার দিকেও তাই, মার দিকেও তাই। ... তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই, তবে আমি তার পূর্বে যতটুকু যৌবন, যতটুকু জীবন পাই, তা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে যেতে চাই!'

দৈব আর-একদিক দিয়া এবার এই যাযাবর দম্পতিদের আক্রমণ করিল। ভিনিসে আসিবার সময়ই শেলির ছোট্ট মেয়েটি হঠাৎ অসুখে এই জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করে। তার কয়েক মাস পরেই ছেলেটিও ভগ্নীর অনুসরণ করিল। শেলির মনে হইল মৃত্যু যেন তাহাকে তাড়া দিয়া লইয়া চলিয়াছে—কোথায় কোন্ অতলে অবশেষে তাহাকেও যে টানিয়া লইবে, কে জানে?

শেলি স্থির করিল, সে ইতালির নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াইবে, এই বর্তমানের জগৎ হইতে সে অতীতের জগতে ফিরিয়া যাইবে—দান্তের ইতালিতে, মাইকেল এঞ্জোলোর ইতালিতে, গিওতোর ইতালিতে। যাযাবর আবার পথে বাহির হইল।

রোম—রোম হইতে আসিল নেপলস্ শহরে। নেপল্‌সের সমুদ্রতীরে বসিয়া কবি ধ্যান-নেত্রে দেখিত, সমুদ্রের অতল-দেশ হইতে কে যেন তাহাকে আহ্বান করিতেছে। বাস্তবতার বিরুদ্ধে রূঢ় সংগ্রামে অবসন্ন কবির চিত্ত সেদিন সেই সমুদ্রতীরে গাহিয়া উঠিল :

www.pathagar.com

'....হায়, আশা নাই, স্বাস্থ্য নাই, নাই অন্তরের প্রশান্তি। ধ্যানী আপনার ধ্যানের মধ্যে যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পায়, তাহাও পাইলাম না। আমার চারিদিকে যাহারা আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—খণ্ড প্রেম, খণ্ড আনন্দ, খণ্ড যশ ও ক্ষমতার অসীম পরিতৃপ্তি লইয়া—হাসিয়া তাহারা জীবনকে বলে আনন্দময়; কিন্তু আমার জীবনের সুর, এ কী বিচিত্র বিষণ্ন রাগিণীতে গাঁথা। ...

কিন্তু এই অসীম নির্জনতার মধ্যে ঐ শান্ত তরঙ্গ আর বায়ুমর্মরের মতো বিষাদও যেন শান্ত, শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয় ক্লান্ত শিশুর মতো আমি এই তরঙ্গশীর্ষে শুইয়া পড়িব—নিদ্রার আবরণে মৃত্যু আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইবে—সহসা বুঝিব এই উষ্ণ অধর হিম হইয়া আসিতেছে—মুমূর্ষু মস্তিষ্কে ক্ষীণস্বরে শুধু বাজিবে তরঙ্গের একস্বরা—রাগিণী—'

সেই বিষণ্নতার মধ্যে শেলি দেখিত সম্মুখে বিপুল মানবের জনতা কিন্তু তাহার মধ্যে যেন সে একা। এই বিপুল ধরণী, এই কোটি কোটি সন্তান তাহার, তাহাদের মধ্যে যেন কোথাও কেহ তাহার আত্মীয় নাই।

অবশেষে পিসা নগরে আসিয়া শেলি আবার একটা আড্ডা বাঁধিল। তাহার এক দূর-সম্পর্কের ভাই সেই আড্ডায় আসিয়া যোগ দিল। তিনি সৈন্যবিভাগে চাকরি লইয়া ভারতবর্ষে যান কিন্তু সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ থাকার দরুন তিনি বন্দুক ছাড়িয়া কলম ধরিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সৈন্যবিভাগ হইতে তাহারই মতো বিদায়প্রাপ্ত একটি দম্পতিও আসিয়াছে।

শেলি যথাসময়ে দম্পতিটির সহিত পরিচিত হইল। স্বামীর নাম উইলিয়ামস্, স্ত্রীর নাম জেন। উইলিয়ামস্ ও জেনের সহিত প্রথম দর্শনেই শেলি বুঝিল যে, এই অকস্মাৎ মিলনের অন্তরালে নির্মম নিয়তির কোনো ক্রূর বিধান নিশ্চয়ই লুক্কায়িত আছে। জেনের চোখের দিকে চাহিয়া শেলির মনে হইল—সে নারী নয়নে দীপশিখার রহস্য লইয়া আসিয়াছে; উইলিয়ামের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া মনে হইল দরদী বন্ধুর স্পর্শ সেখানে তাহারই জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে।

সেখানে এক ইতালীয় অধ্যাপকও আসিতেন। একদিন অধ্যাপকটি শেলির নিকট গল্প করিলেন যে, কাউন্ট ভিভিয়ানি ফ্লোরেন্সের একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি। তাঁহার দুই বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দুই অপরূপ সুন্দরী কন্যা জন্মে। প্রথমার মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আসিয়া সংসারে নানারূপ বিভ্রাট ঘটাইতে লাগিল। মেয়ে দুইটির সহিত দুবেলা বিমাতার সংঘর্ষ হয়। পিতাও বিমাতার পক্ষে যোগদান করেন। অবশেষে মেয়েদুটিকে একটি মঠে রাখা হইয়াছে। পিতার ইচ্ছা যদি কোনো পাত্র বিনা-যৌতুকে তাহাদের বিবাহ করিতে চায়, তিনি অচিরেই তাহাদের বিবাহ দিবেন। অধ্যাপকটি শিশুকাল হইতেই মেয়েদুটিকে দেখিয়াছেন এবং তাহাদের রূপ ও প্রতিভার তুলনা নাই। বিশেষত জ্যেষ্ঠা, যেমনই রূপসী তেমনি অসামান্য প্রতিভাশালিনী।

শেলি তন্ময় হইয়া গল্প শুনিতেছিল। অধ্যাপকটি বলিয়া চলিলেন, 'হতভাগিনী আজ সমস্ত রূপ-যৌবন-প্রতিভা নিয়ে কারারুদ্ধ বিহঙ্গমের মতো মঠে অবরুদ্ধ হয়ে আছে! আমি জানি সেই অবরোধ তার পক্ষে কী ভয়াবহ যন্ত্রণা। সেদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখি ফুলের গাছে জল দিচ্ছে। আমাকে দেখে বললে—এরা মূক, এরা এক জায়গায় স্থাণু হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা রক্তমাংসের মানুষ, আমাদের এই নিষ্ঠুর অবরোধ কি শোভা পায়।

www.pathagar.com

সেই মঠের আবহাওয়ার মধ্যে তুমি যদি তাদের দেখ তাহলে তাদের করুণা করতেই হয়!'

এই গল্পের মধ্যেই শেলির মন কখন সেই মঠের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই দুইটি অবরুদ্ধ কিশোরীর সন্ধানে বাহির হইয়া গিয়াছিল। পৌরাণিক যুগের নাইটদের মতো শেলির মন সেই মঠের কারাপ্রাচীরে অবরুদ্ধ মুমূর্ষু রূপকন্যাদের উদ্ধারের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিল! পৃথিবী সুন্দরের এতটুকু স্পর্শের অভাবে যখন শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, তখন কিনা অপ্রয়োজনীয়তার পীড়নে সুন্দর লোকচক্ষুর অন্তরালে বনকুসুমের মতো বৃথাই শুকাইয়া পড়িবে?

একদিন শেলি সত্যসত্যই সেই অধ্যাপকটিকে সঙ্গে লইয়া সেই অবরুদ্ধা সুন্দরীর অন্বেষণে যাত্রা করিল। এতদিন অন্তরে যে তন্ত্রী মূক হইয়া পড়িয়াছিল, অভিনব আবির্ভাবের আকাঙ্ক্ষায় তাহা নব নব সুরে সহসা আবার বাজিয়া উঠিল।

মঠের অন্ধকার দরদালানের এককোণে শেলি দাঁড়াইয়া রহিল। মঠাধ্যক্ষ এমিলিয়াকে (বড়বোনটির তাহাই নাম) আনিতে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই অদূরে মঠের আধো-অন্ধকারের মধ্যে স্থিরা সৌদামিনীর মতো এক অপরূপ নারীমূর্তি ফুটিয়া উঠিল। ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর যেন সে মূর্তি রচনা করিয়াছেন। এমিলিয়া আরও নিকটে আসিল। তাহারও সম্মুখে সবিস্ময়ে সে দেখে, অলিম্পিয়াসের চূড়া হইতে কোন্ দেবতা আজ আসিয়াছে এতদিনের নিরুদ্ধ বাসনার অর্ঘ্য উপচার লইবার জন্য। এই আকস্মিক মিলনে, সেই মঠের আধো-অন্ধকারে, দুইজনে দুইজনার দিকে চাহিয়া বুঝিল, তাহারা এতদিন ধরিয়া যেন পরস্পর পরস্পরের জন্যেই অপেক্ষা করিতেছিল। শেলি এমিলিয়ার চোখের দিকে গভীরভাবে চাহিয়া দেখিলেন—বৃহৎ আয়ত কৃষ্ণচক্ষু, তৃষ্ণায় আতুর, যৌবন পল্লবে পল্লবে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

প্রথম দর্শনেই এমিলিয়া শেলির অন্তরের সবখানি জুড়িয়া বসিল। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া শেলি অকপটচিত্তে মেরিকে সমস্ত কথা বলিল! যে তন্ত্রী বহুদিন ধরিয়া অন্তরে মূক হইয়াছিল, এমিলিয়ার দর্শনে আজ আবার তাহা মুখর হইয়া উঠিয়াছে। নব নব কবিতা, নব নব ছন্দ, নব নব রূপ, মধুমত্ত ভ্রমরের মতো অন্তরে নিশিদিন গুঞ্জন করিয়া ফিরে। সেখানে আর কেহ নাই—মেরি নয়, বায়রন নয়, হ্যারিয়েটের জন্য শোক নয়, ফ্যানির জন্য ব্যথা নয়—আপনার অভিনব স্বর্গলোকে উদাসীন স্রষ্টা আপনার সৃষ্টি লইয়া মত্ত। এমিলিয়া শুধু আছে তাহার দেহ লইয়া নয়, বৈদেহী কাব্যলক্ষ্মীর মতো সে আজ আসিয়াছে শুধু কবিকে তাহার স্বর্গলোকের পথে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে।

একে জেনের অস্তিত্বে মেরির সমস্ত জীবন বিষাক্ত হইয়া আসিতেছিল, তাহার উপর এমিলিয়ার আবির্ভাবে মেরির নারীহৃদয় একেবারে বিচলিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক সৃষ্টির সহিত, প্রত্যেক স্রষ্টার অন্তরে যে উদাসীন নির্মমতা থাকে, তাহা কোনো জাগতিক সম্বন্ধের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইল বলিয়া আপনার প্রকাশ সঙ্কুচিত করে না। অনেকের পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্যের কারণ হইলেও, ইহাই সৃষ্টির অমোঘ নিয়ম। হ্যারিয়েট তাহা বুঝিতে পারে নাই, মেরি তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু সহ্য করিতে তাহার বেদনা জাগিতেছিল।

শেলি এমিলিয়ার সহিত দেখা করিতে যাইবার সময় মেরিকে সঙ্গে লইয়া যাইত। এমিলিয়া মেরিকে চিঠি লিখিত। মেরি আপনার অন্তরের বিক্ষোভ লুকাইয়া সে চিঠির উত্তর দিত। এমিলিয়ার আবির্ভাবে শেলির কাব্যপ্রতিভা মধ্যাহ্ন-রবির তেজে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। এমিলিয়াকে কেন্দ্র করিয়া ইতালির মদির-সিক্ত পবনে সেদিন যে-সমস্ত অপরূপ ছন্দ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল; আজ তাহা এমিলিয়া, মেরিকে ছাড়াইয়া সমগ্র জগতের রসিক-

www.pathagar.com

হৃদয়ে অভিনব ঝঙ্কার তুলিতেছে। ফ্লোরেন্সের নির্জন অরণ্যে দান্তে যেমন বিয়াত্রিচের একদিনের সাক্ষাতের স্মৃতিকে অনন্তকালের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিবার জন্য *Vita Nouva* করেন, শেলি সেইরূপ এই অভিনব আবির্ভাবকে অনাগত মানবের রস-পরিতৃপ্তির জন্য ছন্দে রূপ দিতে লাগিল।

সেদিন শেলির পরিপূর্ণ হৃদয়ের সেই আহ্বান, "Spouse Sister, Angel!" অনন্তকালের হৃদস্পন্দনের তালে নিত্য দুলিয়া উঠিতেছে। সেদিনকার কবির বাসনা :

"We shall become the same, we shall be one
Spirit within two frames, Oh!
wherefore tow?...
Our breath shall intermix, our bosoms bound,
And our veins beat together ...
One hope within two wills, one will beneath
Two overshadowing mind, one life, one death,
One haven, one hell, one immortality,
And one annihilation. Woe is me !
The winged words on which my soul would pierce
Into the height of Love's rare universe,
Are chains of lead around its flight of fire—
I pant, I sink, I tremble, I expire!

—আজ রস-বুভুক্ষিত শতাব্দীর জন্য অমৃতধারা সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে। মেরি সানন্দে যখন শেলির এই সমস্ত কবিতা শুনিত তখন অন্তরের আর একদিকে এক মহা নিরানন্দ তাহাকে পাইয়া বসিত, যখন সে ভাবিত সে-কাব্যের নায়িকা আর সে নয় !

কিন্তু অতি অল্পকাল পরেই এমিলিয়ার পিতা মেরির অন্তরের দুঃখ নিবারণ করিয়া দিলেন। এমিলিয়া পিতার পত্র পাইল যে, তিনি তাঁহার বিবাহ ঠিক করিয়াছেন এবং তাহার দিনও স্থির হইয়া গিয়াছে।

শেলির অভিনব Vita Nouva তখনো রচনা শেষ হয় নাই, সে শুনিল এমিলিয়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মেরি আনন্দিত হইল ; শেলি ডায়েরিতে লিখিল :*"I think one is always in love with something or other ; the error consists in seeking in a mortal image the likeness of what is perhaps, eternal.* "মানুষ সর্বদাই কিছু-না-কিছু ভালোবাসিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায় ; কিন্তু যাহা অনন্ত যাহা অবিনশ্বর, তাহাকে এই মর্ত-দেহের মধ্যে খোঁজা ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছু নয় !" কবির চিত্ত তাই বিহ্বল হইয়া সেদিন গাহিয়াছিল :

কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির বিরাট ছায়া আমাদের মধ্যে
ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে।
আমরা তার কিছুই জানি না ; কোনোদিন তাকে দেখি নি।
এই বিচিত্র জগতকে সে ক্ষণে ক্ষণে তার চঞ্চল চকিত স্পর্শে
সচকিত করে দিয়ে যাচ্ছে,
যেমন যায় বসন্তের দক্ষিণ-বায়ু পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে,

www.pathagar.com

যেমন করে জোছনা আসে দেবদারুবনের আড়াল এড়িয়ে
পার্বত্য নির্ঝরিণীর উপর,
তেমনি তার অলক্ষ্য চঞ্চল কটাক্ষ নিত্য এসে পড়ে প্রতি
মানবের হৃদয়ে আর আননে।
সে ছায়া রয়েছে আমাদের পরিব্যাপ্ত করে, যেমন তার আছে
সন্ধ্যার বর্ণসমারোহ আর দিনান্তের শ্রান্ত সঙ্গীত,
নক্ষত্রের আলোক যেমন আছে রাত্রির ভাসমান মেঘমালা,
বিস্মৃত বাণী—সঙ্গীতের সুরের স্মৃতির মতো,
সে আছে সুন্দরের প্রতি অনির্বচনীয় প্রকাশে।
হে সৌন্দর্যলক্ষ্মী, তোমার অন্তরের আলোকপাতে,
মানবের দেহ মনকে তুমি সুন্দরতর,
পবিত্রতর করে তোলো।
কিন্তু তুমি কোথায়?
কেন তুমি চলে যাও, আমাদের এই অশ্রুসিন্ধু পারের
কুহেলিকাবৃত ধরণীকে বিষণ্ন শূন্যতায় ভরে দিয়ে?
নির্ঝরিণীর জলে সূর্য কেন নিত্য ইন্দ্রধনু রচনা করে না?
কেন ভয় আর ভাবনা, জন্ম আর মৃত্যু,
ধরণীর এই দিবালোককে ক্ষণে ক্ষণে ম্লান করে দেয়?
কেন এই প্রেম? কেনই বা এই অকরুণ? কেন আশা?
কেনই বা এই ব্যর্থতা?
ঐ উর্ধ্বলোক হতে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর আজও এল না।
কত কবি, কত ঋষি কত নাম ধরে আহ্বান করে এই প্রশ্নের
উত্তর চেয়েছে।
আজ সেই সমস্ত নাম আর আহ্বান শুধু মানব-অন্তরের
ব্যর্থতার সাক্ষীরূপেই রয়ে গেল।
এই-যে দেখছি আশেপাশের জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে
সংশয়, আকস্মিকতা আর অর পরিবর্তশীলতা—
কেউ পারল না এর কোনো রহস্য উদ্ঘাটন করতে।
শুধু তোর দিব্যজ্যোতি—
কুহেলিকা অপসারিত গিরিশৃঙ্গের মতো,
সহসা নিশীথ-বায়ুর আঘাতে জাগরিত বনানীর নিস্তব্ধ
তন্ত্রীর মতো,
মধ্যরাত্রের নিঃশব্দবাহী নদীর তরল জলধারার উপর
জোছনালোকের মতো,
মানবজীবনের এই অশান্ত দুঃস্বপ্নকে সৌন্দর্যে ও সত্যে
অনির্বচনীয় করে তোলে।
কোন্ অদৃশ্য মুহূর্তের অতর্কিত দানের মতো,
আসে প্রেম, আশা, যশগৌরব লালসা।

www.pathagar.com

আবার কখন চঞ্চল মেঘের মতো চলে যায় তারা।
কিন্তু এই মানুষই হত দেবতার মতো ষড়ৈশ্বর্যশালী,
যদি হে বিরাট, হে অপরিজ্ঞেয়,
তার অন্তরে তোমার জ্যোতির চির-আবাস রচনা করতে।
আমি দেখেছি তোমার প্রেমের দূতালি প্রেমিক-প্রেমিকার
নয়নে,
কখনো আশায়, কখনো বেদনায় জাগ্রত হয়ে উঠেছে।
মানবচিত্তে তুমি যে অমৃত-আহার্য,
মুমূর্ষু দীপশিখার তুমি যে তমো-নিধি।
তুমি যেয়ো না, এমনি করে ছায়ার মতো তুমি চলে যেয়ো না—
যদি যাও, তাহলে মৃত্যুও হয়ে উঠবে,
এই জীবনের মতো এক নিশীথ-আতঙ্ক।

যখন বালক ছিলাম, তখন প্রেতলোকবাসীদের সন্ধানে ফিরেছি,
নির্জন পরিত্যক্ত প্রাসাদে, মন্দিরে, গিরিগহ্বরে কান পেতে
তাদের আগমন প্রতীক্ষা করেছি,
নক্ষত্রের ম্লান-আলোকে জানা-অজানা কত নাম ধরে বনভূমি
দিয়ে ছুটে চলেছি,
আশা ছিল মনে, হয়তো যারা এ জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে,
তাদের কাছ থেকে তোমার রহস্যের কোনো বার্তা পাব।
—কোনো সাড়া পাই নি।
তারপর একদিন জীবনের এক বাসন্তীলগ্নে,
জীবনের ধ্যানে সহসা তোমার ছায়া এসে পড়ল আমার
উপর,
পরমোল্লাসে দুই হাত জোড় করে চিৎকার করে উঠলাম।
প্রতিজ্ঞা করলাম, তোমার জন্যে এবং তোমাকেই,
আমার যা-কিছু শক্তি আছে সমস্ত উৎসর্গ করব।
বলো—সে-প্রতিজ্ঞা কি আমি রাখি নি?
তারা সব সাক্ষী আছে আমার সাধনার নিশীথ-জাগরণ
মুহূর্তগুলি—
আমার প্রেমের আনন্দ-বিষাদ-ক্ষণগুলি;
বাণীহীন বিস্মৃতির অতল-সমুদ্র-তল হতে,
আজ আমি সেই সমস্ত মৃত মুহূর্তের প্রেতমূর্তির আহ্বান
করছি—
তারা এসে সাক্ষ্য দেবে,
যখনি আমার ললাট আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে,
তখনি আমি আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে কামনা করেছি,

www.pathagar.com

হে অপরিজ্ঞেয় বিরাট মাধুরী,
তুমি এসে এই পৃথিবীকে তার তমসার দাসত্ব থেকে
মুক্ত করে
এমন এক অপরূপ সৃষ্টি করবে, যার রূপ আমি আর ভাষায়
দিতে পারব না।

সেদিন যে-রূপতৃষ্ণা বারে বারে শেলির চিত্তকে ব্যথিত ও আলোড়িত করিয়াছিল—যে অনাদি রহস্য শুধু ক্ষণিক ইঙ্গিত কবিকে প্রলুব্ধ করিত অথচ পরিপূর্ণরূপে ধরা দিত না, যে মূর্তি শুধু ছায়াবসনে মস্তিষ্কের পথে ক্ষণে ক্ষণে বাসন্তী সৌরভ বিলাইয়া অনাদি রহস্যের তলে আবার বিলীন হইয়া যাইত—আজ ভারতের এক কবির বীণায় তাহা আর-এক মূর্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। মহাকালের সে লীলাসঙ্গিনীর চঞ্চল চরণভঙ্গি আজ ভারতের মহাকবির কাব্যের প্রতি ছত্রে বাজিয়া উঠিতেছে। সৃষ্টির প্রথম দিনে যে অনন্তযৌবনা মুক্তবেণি বিবসনা নারী এক হাতে অমৃত, আর হাতে বিষভাণ্ড লইয়া কামনার মথিত সিন্ধু হইতে সমুত্থিত হইয়া বিশ্ববাসনার অরবিন্দ-মাঝে অতি লঘুভার আপনার চরণ স্থাপন করিয়াছিল, সে বিশ্ববিমোহিনী ভারতের কবির কাব্যে আবার জাগিয়া উঠিয়াছে।

যে-কারণে সমাজ, সংসার, বন্ধুবান্ধব হইতে দূরে যাযাবরের মতো শেলি এতদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, ক্রমশ দেখে তাহার ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে সেই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি, অনুদারতা, পঙ্কিলতা আসিয়া তাহারই পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিয়াছে। মেরির পিতা অর্থাভাবের দরুন অর্থসাহায্য চাহিয়া মেয়ের নিকট প্রায়ই পত্র লেখেন ; গডউইন প্রায়ই এইরকম অর্থের আবেদন করিতেন। যখনই সম্ভব হইয়াছে শেলি তাহা পাঠাইয়া দিয়াছে। ইদানীং এই আবেদন এত ঘন ঘন আসিতে লাগিল যে শেলি ও মেরি উভয়েই বিরক্ত হইয়া উঠিল। শেলি রীতিমতো রাগিয়া গডউইনকে পত্র লিখিল। মেয়ে হইয়া পিতার উপর সেই আক্রমণ মেরিকে সহিতে হইল বটে, কিন্তু সেই অপমানবোধ সংসারের নানা ছোটখাটো কাজের মধ্যে দিয়া প্রতিক্রিয়া করিতে লাগিল। মেরি জেনের সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারিত না এবং তাহার স্পষ্টই ধারণা হইল যে, জেন গোপনে শেলিকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে চায়। দুইজনে সামান্য নারীর মতো ঈর্ষায় ক্রমশ প্রকাশ্য কলহ করিতে আরম্ভ করিল। শেলি ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে দেখিল যে, প্রতিদিনের ঘনিষ্ঠতা, তাহাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে-ঐশ্বর্য ছিল, তাহা কবে নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছে।

বায়রন পিসাতে আসিয়া মহা-জাঁকজমকে পিসা শহর সরগরম করিয়া তুলিলেন। বায়রনের ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে চারিদিকে ক্ষুধিত শৃগালের মতো যত আভিজাত্যগর্বী মিলিত হইয়া এক বিকৃত মত্ততার সৃষ্টি করিল। স্থূল দেহগত আনন্দ, ধনগত গর্ব, কল্পনাহীন ঐশ্বর্যের বিকৃত-বিলাস, বাহিরের অনুষ্ঠানে অন্তরের কুণ্ঠিতাকে আত্মগোপন করার চেষ্টা শেলির নিকট নরক-যন্ত্রণা ছিল। তাই যে-আত্মধ্বংসী উন্মাদনার মধ্যে বায়রন নিজেকে ডুবাইলেন, শেলি তাহাতে বায়রনের উপর একেবারে অন্তরে অন্তরে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। সবার চেয়ে ব্যথা লাগিল যে, মেরির অন্তরও বাহিরের সেই বিলাসের তালে সায় দিয়া উঠিল। বল-নাচে, নৌকা-বিহারে, সব নারীর মতো মেরিরও যাইবার বাসনা হইল, ঠিক সেইরকমভাবে সজ্জিত হইয়া। এই বিষয়ে ক্রমশ শেলি ও মেরির মধ্যে প্রকাশ্য বাদ-বিসম্বাদ হইতে লাগিল। মেরি অনেক সময়ে রাগিয়া বলিত—'কেন যাব না ; সবাই তো যায়।'

www.pathagar.com

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শেলি বলিত, 'সবাই? কে সবাই? 'সবাই' কাকে বলে জানো, মেরি?'

এই 'সবাই'কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মেরি ক্রমশ গির্জায় যাইতে আরম্ভ করিল।

সেই আবহাওয়ার মধ্যে শেলির অন্তর 'সবাই' হইতে দূরে একটি সুন্দর অবকাশ রচনা করিয়া লইয়াছিল। জেন ও উইলিয়ামের সাহচর্যের মধ্যে শেলি আপনার অন্তরের অমৃত-আহার্য পাইল। জেন বীণা লইয়া গান গাহিত, শেলি তন্ময় হইয়া শুনিত। জেনের অপূর্ব কণ্ঠস্বরে শেলির মন আবার এই জগৎ হইতে দূরের কাব্যের কল্পলোকে যাত্রা করিত। জেন বুঝিত শেলির কাব্যসৃষ্টিতে সে কতখানি সহায়তা করিতেছে। শেলিও আপনার অন্তরের দুর্বলতার কথা জানিত, তাই সে জেনকে আপনার অন্তরের গোপন লোক হইতে বাহিরে আনিত না। চির-অনুরক্ত ভক্তের মতো উইলিয়ামস্ ও জেনের নিকট শেলি আত্মসমর্পণ করিল।

উইলিয়ামস্ প্রায়ই শেলির নিকট তাঁহার এক বন্ধুর কথা গল্প করিতেন। তাহার নাম ট্রেলনি। সৈন্যবিভাগে সে ছিল একজন দক্ষ নাবিক। উইলিয়ামসের মুখে শেলির কথা শুনিয়া সে তাহাদের সঙ্গে থাকিতে চায়।

উইলিয়ামসের কথামতো ট্রেলনি আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন।

ট্রেলনির সহিত শেলির গভীর প্রণয় হইয়া গেল। যাহারা শুধু কল্পনায় জীবনযাপন করিয়া আসিয়াছে, তাহারা স্বভাবতই কর্মিষ্ঠ লোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ট্রেলনির বলিষ্ঠ দেহ, তাহার কর্মময় জীবন শেলির বড় ভালো লাগিত। সে ঠিক করিল, ট্রেলনির নিকট সে নৌবিদ্যা শিখিবে এবং তাহাদের নিজের নৌকা করিয়া তাহারা সমগ্র গ্রীষ্ম সমুদ্রেই অতিবাহিত করিবে। উইলিয়ামসেরও এ বিষয়ে মত পাওয়া গেল। উইলিয়ামস্, ট্রেলনি আর জেন—শেলির পরম ভক্ত হইয়া গেল। উইলিয়াম ও ট্রেলনি ভাবিতে পারেন নাই—তাঁহাদের দুইজনের এই আসক্তি শেলির জীবনের শেষলগ্নকে আগাইয়া আনিবে। যে-অতল রহস্যতলে শেলির প্রতীক্ষায় অন্তরের রূপকন্যা অপেক্ষা করিতেছিল, উইলিয়ামস্ ও ট্রেলনি শেলির অন্তরের সহিত সেই সমুদ্রের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

শেলির সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায়ই আলোচনা করেন। ট্রেলনি বলেন, 'আমার মনে হয়, বায়রন শেলিকে মনে মনে হিংসা করে। যদিও বায়রনের 'চাইল্ড হ্যারল্ড'-এর যখন কোনো নতুন অধ্যায় প্রকাশিত হয়, তখন ক্রেতাদের ভিড় সংযত করবার জন্য প্রকাশকদের পুলিশ ডাকতে হয়—অথচ শেলির বই-এর মোট দশজন পাঠকও হয়তো নেই—'

উইলিয়ামস বলেন, 'তা সত্যি হতে পারে। কিন্তু বায়রন তার নিজের প্রবৃত্তির দাস—প্রত্যেক মেয়ের কামনার ইঙ্গিতে তার জীবন চলে। শেলি আপনার ভাবে আপনি স্বপ্রতিষ্ঠিত। সে কথা বায়রন ভালো করেই জানে।'

আলোচনা চলে। ট্রেলনি বলেন, 'শেলির সবচেয়ে বিপদের বিষয় যে আত্মরক্ষা করবার তার সামান্য চেষ্টা নেই। সেদিন নদীতে স্নান করছিলাম....পরিষ্কার স্বচ্ছ জল—তলা দেখা যায়...শেলির সাধ গেল সে সাঁতার শিখবে...আমি বললাম, জলে নেমে প্রথমে ভাসতে চেষ্টা কর...তখুনি জলে সে নেমে পড়ল এবং সোজা বিনা-চেষ্টায় একেবারে তলায় গিয়ে পড়ল—ডুবে যাবার সময় আমি দেখলাম—নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কোনোরকম হাত পা ছুড়ল না পর্যন্ত—আমি না-থাকলে সেদিন জলের তলাতেই চিরজীবনের মতো থেকে যেতে হত—'

শেলির অন্তরের সঙ্গে সমুদ্রের সেই প্রথম আত্মীয়তা।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা পিসার সমুদ্রের ধারে এক ভগ্নপ্রায় প্রাসাদ ভাড়া

www.pathagar.com

লইয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহারা সবাই একত্রে বাস করিতে লাগিলেন। ট্রেলনি অচিরেই একখানি নৌকা করাইয়া আনিলেন। শেলি পরমোৎসাহে উইলিয়ামস ও ট্রেলনির সহিত নৌবিদ্যা শিখিতে লাগিল।

এই নূতন বাড়িতে আসিয়া শেলির মনে পুরনো দিনের আনন্দ ফিরিয়া আসিল। সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জনে সে নাগকন্যাদের আহ্বান-ধ্বনি শুনিত ; সারাদিন সেই সমুদ্রের ধারে, জলকল্লোলের সাথে, তাহার মনে হইত, তাহার চারিদিকে ছায়ামূর্তিতে কাহারা ঘিরিয়া আছে। সূর্যকিরণ বালুচরে আসিয়া ঝিকমিক করিত, শেলি আপনার মনে কাব্য রচনা করিয়া যাইত। মাঝে মাঝে সমুদ্রের নীল জলের দিকে চাহিত, দেখিত তরঙ্গ-শীর্ষে কে এক নারী দাঁড়াইয়া আছে—হাতে তাহার বীণা, কণ্ঠে অমৃত-আহ্বান সঙ্গীত।

বহুদিন ধরিয়া শেলি ভাবিতেছিল—কেমন করিয়া তাহার কবি-বন্ধু হান্টকে ইংলন্ড হইতে সরাইয়া ইতালিতে আনা যায়। কারণ ইংলন্ডে হান্টের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। হান্টের পাওনাদার এবং রাজনৈতিক শত্রুরা কবি বলিয়া তাঁহাকে কিছুমাত্র রেহাই দেয় নাই—বোধহয় কোনোকালে কোনো লোক দেয় না। তবে ইংলন্ড এ বিষয়ে একটা বিশেষ গৌরব অর্জন করিয়াছে। শেলি, বায়রন, কীটস্, ব্রাউনিঙ, সুইনাবার্ন্ ইংলন্ডের সন্তান নয়। ইংলন্ডের সন্তান—কিপলিঙ আর টেনিসন, সাদে আর পোপ্। শেক্সপিয়ার তাঁহার জীবদ্দশায়, এমনকি মৃত্যুর পর একশো বছর পর্যন্ত, যে অপমান ও নিন্দা ইংলন্ডের শ্রেষ্ঠ রসিকবর্গের (?) নিকট হইতে পাইয়াছে, এবং তাঁহার লেখার কুৎসা ও ধারাবাহিক জঘন্য সমালোচনা ইংরেজি সাহিত্যের পাতায় যতখানি আছে, বোধহয় ততখানি আর কোনো কবি সম্বন্ধে কোথাও নাই। জনসনের বিখ্যাত সাহিত্যিক আড্ডা হইতেই প্রথম ইংলন্ডের লোক শোনে যে, 'শেক্সপিয়ার একটা চোর, একটা দাঁড়কাক, শুধু ময়ূরপুচ্ছ দিয়া লোক ভুলাইতে চায়।' ওথেলো পড়িয়া টমাস রাইমার বলিয়াছিলেন যে, 'এ বই অবশ্য খুবই ভালো—খুব নীতিমূলক, কারণ আসল কথা যা এই বইতে বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে মেয়েরা যে-যার রুমাল সামলাও।' ইংলন্ড শুধু কবিকে চায় না—চায় রাজকবিকে।

হান্টের ব্যাপার লইয়া শেলি বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিল। হান্টের পরিবারটিও সুবৃহৎ—সাত-সাতটি ছেলে। বায়রনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শেলি ঠিক করিল যে, ইতালিতে একখানি কাগজ বাহির করা হইবে এবং হান্টকেই তাহার সকল স্বত্ব দিয়া দেওয়া হইবে এবং শেলির অনুরোধে বায়রন তাঁহার সকল লেখা প্রথম সেই কাগজেই প্রকাশ করিবেন স্থির হইল। বায়রন আপনার বাসভবনের খানিকটা হান্টের বসবাসের জন্য ছাড়িয়াও দিলেন। ওধারে ইংলন্ড হইতে হান্ট পরিবার ইতালির অভিমুখে রওনা হইল।

হান্টের সহিত বায়রনের সাক্ষাৎ পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য শেলি ও উইলিয়ামস্ লেগহর্নে আসিয়া হান্টের সহিত মিলিত হইল এবং সেখান হইতে হান্ট পরিবারকে লইয়া শেলি ও ট্রেলনি পিসা অভিমুখে রওনা হইল। উইলিয়ামস্ বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষায় লেগহর্নেই থাকিয়া গেলেন।

বায়রনের সহিত বোঝাপড়া শেষ করিয়া শেলি ও ট্রেলনি পুনরায় লেগহর্নে ফিরিয়া আসিল। সে বৎসর জুলাই মাসে সহসা ভয়ানক গরম পড়ে। আকাশ অগ্নিকুণ্ডের মতো অনলবর্ষণ করিত। চাষারা মাঠের কাজ ফেলিয়া ঘরে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। রাজপথে পুরোহিতেরা নানারকম মূর্তি লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিত—যদি মেঘের দেবতা মাটির

www.pathagar.com

মানুষের দিকে করুণায় চায়।

উইলিয়ামস্ গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই শেলি আসিবামাত্রই তাঁহারা প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করিলেন। ট্রেলনির নৌকার অংশবিশেষ খারাপ হইয়া যাওয়ার দরুন ট্রেলনিকে দুই-তিন দিনের জন্য লেগহর্নে থাকিয়া যাইতে হইল। শেলি ও উইলিয়ামস্ যাত্রা করিল। ঈশান কোণে তখন কোথা হইতে স্তরে স্তরে শ্যামল কোমল মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছিল—কোন্ অদৃশ্য রন্ধ্রপথ হইতে এতদিনের নিরুদ্ধ বাষ্প ঝড়ের মূর্তিতে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল।

ট্রেলনি দূরবীন লইয়া বন্ধুর নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দূরে শেলির নৌকাখানি ধূসর হইয়া আসিয়াছে। যেন দিকরেখার সন্ধ্যার নীড়ে শ্রান্তপক্ষ বিহঙ্গম ফিরিয়া চলিয়াছে। ক্রমশ তাহাও আর দেখা গেল না। প্রমত্ত অন্ধকারে দিকরেখা অদৃশ্য হইয়া গেল। সমুদ্র আকাশকে স্পর্শ করিবার জন্য তরঙ্গ-বাহু উত্তোলন করিল। মাথার উপরে বজ্র মুহুর্মুহু গর্জন করিয়া উঠিতে লাগিল। যেন নাগকন্যারা আজ সমুদ্রের প্রবালশয্যা ত্যাগ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে পৃথিবী ভ্রমণে আসিয়াছে—অতল রহস্যের অসীম রাজ্য হইতে আজ রাজদূতেরা বাহির হইয়াছে—অতল রহস্যের অধিবাসী এক প্রবাসী আত্মাকে পুনরায় অতলের মহাঙ্গনে প্রত্যুদগমন করিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া।

ওধারে উপসাগরের অপর কূলের দুইটি বিষণ্ণ নারীমূর্তি প্রভাতে, সন্ধ্যায়, নিশীথে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকে। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই; কেন যেন সহসা তাহারা মৌনী হইয়া উঠিয়াছে। দুইজনে দুইজনের চোখের দিকে চায় আর কোথা হইতে অশ্রুবাষ্পে তাহাদের চোখ ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। সমুদ্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সমুদ্র যেন তাহাদের নয়নে আসিয়া বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে।

দিন যায়, শেলির নৌকা তো দেখা যায় না। মেরি ও জেন পাগল হইয়া উঠিল। প্রতিদিন ঝড়বৃষ্টি—অবিশ্রান্ত, অবিরাম। মেরি ও জেন ঠিক করিল এই ঝড়ের মধ্যে তাহারা বাহির হইবে—কোথায়, কোন্ অন্ধকারে বন্ধু তিমির-তরঙ্গ ভেদ করিয়া আসিতেছে—তাহারা আগাইয়া গিয়া দেখিবে। কিন্তু সে ঝড়ে কোনো নাবিক নৌকা ছাড়িল না।

পরের দিন দ্বিপ্রহরে এক চিঠি আসিল। ট্রেলনি শেলিকে লিখিয়াছেন, 'তোমার পৌঁছানোর সংবাদ না পাইয়া বড়ই চিন্তিত আছি। আজ পাঁচদিন হইল এখান হইতে যাত্রা করিয়াছ, অথচ তোমার কোনো খবর নাই—কী ব্যাপার?'

বাহিরে তখনো ঝড় বহিতেছিল। চিঠিখানা মেরির অবশ হস্ত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। দুজনার অশ্রুজলে কে যেন লিখিয়া দিল—সে বন্ধু নাই। আকাশের সে—তাই আকাশ তাহাকে ডাকিয়া লইয়াছে; সাগরের সে—সাগর তাই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়াছে; ঝড়ের সে—তাই ঝড় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে।

পাঁচ-ছয় দিনের অনুসন্ধানের পর উপসাগরের বালুচরে এক বিকৃত মৃতদেহ পাওয়া গেল। সমুদ্রের মাছে তাহার দেহের উন্মুক্ত অংশ খাইয়া ফেলিয়াছে। ট্রেলনি মৃতদেহ দেখিলেন। জামার পকেটে হাত দিয়া দেখেন এক পকেটে সফোক্লিস, আর এক পকেটে কীটসের কবিতার বই—কে যেন তাড়াতাড়ি পড়িতে পড়িতে উল্টাইয়া পকেটে ভরিয়া রাখিয়াছে—আবার তুলিয়া পড়িবে বলিয়া! ট্রেলনি বন্ধুকে চিনিলেন—কিছুদূরে উইলিয়ামসেরও মৃতদেহ পাওয়া গেল। ধীরে তীরের বালু খুঁড়িয়া সমুদ্রের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা হইতে রক্ষা করিবার জন্য মৃতদেহ দুইটি বালুর মধ্যে রাখিয়া

www.pathagar.com

মেরিকে সংবাদ দিবার জন্য আসিলেন।

মেরির বাড়িতে আসিয়া ট্রেলনির পা অবশ হইয়া আসিল। অবশের মতো তিনি বাড়িতে ঢুকিলেন—নির্জন, নিস্তব্ধ ঘরে শুধু একটি দীপ জ্বলিতেছে। মৃদু, ধীর, স্তিমিত তাহার কম্পন, যেন মেরির হৃদয়। পায়ের শব্দ পাইয়া মেরি ছুটিয়া আসিয়া ট্রেলনির মুখের দিকে চাহিল। 'কিছু খবর কি পেলেন?' ট্রেলনি কোনো উত্তর না দিয়া তেমনি নতমস্তকে ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। দীপশিখাটি তখন নিভিয়া গিয়াছিল।

সমুদ্রের ধারে চিতাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রাচীন গ্রিকদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যেভাবে সম্পন্ন করা হইত সেইভাবে উইলিয়ামস্ ও শেলির শেষক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

প্রথম দিন উইলিয়ামসের মৃতদেহ বালু হইতে বাহির করা হইল। কতকগুলি হাড় আর মাংসের পিণ্ড। সমুদ্রতীরে চিতা সাজানো হইল। বায়রন রাশি রাশি পাইন আর চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। চন্দনকাষ্ঠের শয্যায় উইলিয়ামসকে শায়িত করা হইল।

যে-কবি মানবকে চিরকাল বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন সে-কবিরও চোখে জল দেখা দিল। অশ্রু লুকাইবার জন্য বায়রন উন্মত্তের মতো হাসিয়া উঠিলেন।

চন্দনকাষ্ঠে অগ্নিসংলগ্ন করা হইল। সমুদ্রের হাওয়ায় চিতা জ্বলিয়া উঠিল। বায়রন সেই চিতাগ্নিতে পুরনো কালের গ্রিক পুরোহিতদের মতো সুরা আর সুগন্ধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। শিখা আকাশের দিকে উঠিল। সেই চিতাগ্নিতে সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বায়রনের বিদ্রোহী মন কিসের বিরুদ্ধে যেন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও কিছু না-বলিয়া তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সমুদ্র হইতে যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন চিতাগ্নি নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় দিন শেলির মৃতদেহ সৎকার করা হইল। স্বচ্ছ আকাশ হইতে সুন্দর আলো আসিয়া সমুদ্রের কালো আবরণকে স্বচ্ছ নীল করিয়া তুলিল। তীরের বালুগুলি হীরকচূর্ণের মতো জ্বলিতে লাগিল। তীরে তীরে শান্ত সমুদ্র মৃদু মর্মরধ্বনি তুলিতেছিল। দূরে পাইন-বনের পারে পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলিয়া পড়িতেছিল। পাইন-বন শান্ত, নিস্তব্ধ, মধুর।

শেলির দেহাবশেষের দিকে চাহিয়া বায়রনের বুক ভাঙিয়া যাইতেছিল। বায়রনের সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—'হায়, প্রমিথিয়ূস!'

আবার সমুদ্রতীরে চন্দনকাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিল—আবার সুরায় আর সুগন্ধে ইতালির অখ্যাত সাগরকূল ভরিয়া উঠিল। মৃতদেহ যখন জ্বলিয়া শেষ হইয়া আসিতেছিল, তখনও হৃদয়টুক পোড়ে নাই। পুড়িতে দেরি হইতেছিল। ট্রেলনি উন্মাদের মতো আগুনের মধ্য হইতে হৃদয়টুকু তুলিয়া লইলেন। সমস্ত হাতখানি ঝলসিয়া গেল।

দেহাবশেষরূপে যাহা কিছু রহিল তাহা সংগ্রহ করিয়া ট্রেলনি একটি চন্দন-পেটিকায় রাখিয়া দিলেন। কৌতূহলী শিশুর দল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিল। চলিয়া যাইবার সময় তাহারা আপনারা বলাবলি করিতে লাগিল যে এই হাড়গুলি যখন ইংলন্ডে পৌঁছিবে, তখনই আবার এই লোকটি বাঁচিয়া উঠিবে।

* * *

সেদিন ইতালির সমুদ্রকূলে যে চিতাগ্নি জ্বলে তাহার আভায় ইংলন্ডের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল, তবে সে বেদনায় নয়—লজ্জায়।

www.pathagar.com

কিশোর তরুণদের সামনে
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের সংগ্রামী, কর্মময় ও
বেদনাজাগ্রত জীবনকাহিনী তুলে ধরার লক্ষ্যে
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
'জীবনী গ্রন্থমালা' শীর্ষক একটি সিরিজের
প্রকাশনা শুরু করেছে।
শ্রেষ্ঠ মানুষদের উদ্দীপ্ত জীবনকাহিনী
পড়ার ভেতর দিয়ে নিজেদের
অগোচরে ঐ সব মানুষদের জীবন, আদর্শ,
সংগ্রাম ও মূল্যবোধের বলীয়ান স্বপ্নে
তারা উদ্বুদ্ধ হবে এই আমাদের বিশ্বাস।
বইটি আমাদের তরুণ–তরুণীদের জীবনকে
দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

9841801183303

www.pathagar.com